আতিয়্যা ইবনে আবদুল গাফের বলেন ঃ ঈমানদারের ভেতরের অবস্থা বাইরের অবস্থার চেয়ে ভাল হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করে বলেন ঃ সে হচ্ছে আমার সত্যিকার বান্দা। অতএব বুঝা গেল, ভেতর ও বাইর সমান হওয়া এক প্রকার সিদক।

(৬) ধর্মীয় মকামসমূহে সত্যবাদিতা হচ্ছে খওফ, রেযা, যুহদ, তাওয়াক্কুল,মহব্বত ইত্যাদি তরীকতের বিষয়সমূহে যথার্থ হওয়া। কেননা, এসব বিষয়ের এক অংশ হচ্ছে সূচনা; এরপর আসে এগুলোর চূড়ান্ত সীমা তথা হাকীকত (স্বরূপ)। যে ব্যক্তি এগুলোর হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছে যায়, সে-ই যথার্থ মুহাক্কিক। কোন গুণ কারো মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেলে সে ব্যক্তিকে সে গুণে যথার্থ বলা হয়। যেমন, আমরা বলি অমুক ব্যক্তি যথার্থ বীর, অমুক ব্যক্তি যথার্থ খোদাভীরু। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ -

অর্থাৎ, ঈমানদার তারাই, যারা আল্লাহ ও রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর সন্দিহান হয় না এবং নিজের ধন ও প্রাণের বিনিময়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করে। তারাই যথার্থ নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী।

وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا -

অর্থাৎ, কিন্তু সৎকর্ম হল আল্লাহর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাব সমূহের প্রতি, নবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা, তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির এবং ভিক্ষুকদের এবং ক্রীতদাসের জন্যে সম্পদ ব্যয় করা। বস্তুত যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে, যারা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, বিপদাপদ ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করে, তারাই হল সত্যবাদী।

এক্ষণে আমরা খওফ তথা ভয়ের ক্ষেত্রে যথার্থতার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। যে বান্দা আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে। কিন্তু এ ভয় এমন যে, একে কেবল শাব্দিক দিক দিয়েই ভয় বলা যায়। সত্যিকার ভয়ের যে স্তর তা সেই পর্যন্ত পৌঁছল না। দেখ, মানুষ যখন কোন বাদশাহকে ভয় করে অথবা পথিমধ্যে ডাকাতকে ভয় করে, তখন তার শরীরের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, হাত-পা কাঁপতে থাকে, জীবন তিক্ত হয়ে যায় এবং আহার-নিদ্রা কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু জাহান্নামের আগুনকে ভয় করার পর মানুষ যখন কোন গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়, তখন এসব কিছুই হয় না। তার দেহের রঙ স্বাভাবিকই থাকে এবং হাত-পা কাঁপে না। এর কারণ কি? রসূল করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

لم ارمثل النار نام ها ربها ولامثل الجنة نام طالبها -

অর্থাৎ, দোযখ থেকে পলায়নকারী যেভাবে ঘুমায়, তেমন ঘুমাতে আমি কাউকে দেখি না এবং জান্নাত অন্বেষণকারীর মতও আমি কাউকে ঘুমুতে দেখি না।

সুতরাং খওফের স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছা খুবই কঠিন। এসব মকামের স্বরূপ ও সিদকের কোন সীমা নেই। প্রত্যেকেই নিজের অবস্থা অনুযায়ী এগুলোর অংশ প্রাপ্ত হয়। যে বেশী অংশ পায়, তাকেই সত্যিকার বান্দা বলা হয়। বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত জিবরাঈলকে বললেন— আমি আপনাকে আসল আকৃতিতে দেখতে চাই। জিবরাঈল বললেন ঃ আপনি আমাকে আসল আকৃতিতে দেখলে ঠিক থাকতে পারবেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না, আমি দেখতেই চাই। জিবরাঈল ওয়াদা করলেন ঃ আচ্ছা, জোছনা রাতে 'বাকী' নামক স্থানে দেখিয়ে দেব।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) চাঁদনী রাতে সেখানে পৌঁছলে জিবরাঈলকে দেখলেন আকাশের সমগ্র দিগন্ত আচ্ছাদিত করে বিরাজমান। দেখার সাথে সাথেই তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। সংজ্ঞা ফিরে আসার পর যখন তিনি চোখ খুললেন, তখন জিবরাঈলকে পূর্বের আকৃতিতে দেখে বললেন ঃ আমার মনে হয় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মাঝে এ ধরনের কেউ নেই। জিবরাঈল আরয করলেন ঃ আপনি ইসরাফীলকে দেখলে ভালই হত। আরশে মোয়াল্লা তার কাঁধে এবং পা পৃথিবীর সর্বনিম্নে নামানো। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর মাহাত্ম্যের সামনে যখন তিনি সংকুচিত হন, তখন ক্ষুদ্র পাখীর মত হয়ে যান। এখানে দেখা উচিত যে, হযরত ইসরাফীল খওফের কত বিরাট অংশ প্রাপ্ত হয়েছেন। সকল ফেরেশতা এরূপ নন। কেননা, তারা খওফের ক্ষেত্রে সমান নন। হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন— আমি মে'রাজ রজনীতে ঊর্ধ্বাকাশে হযরত জিবরাঈলকে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে উটের পিঠে পুরানো চাদরের মত পড়ে থাকতে দেখেছি। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও খওফ ছিল। কিন্তু তাদের খওফ রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খওফের সমান ছিল না।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল, খওফ, মহব্বত ইত্যাদি স্তরগুলোতে যারা সাদেক তথা নিষ্ঠাবান, তাদের সংখ্যা খুবই কম। মাঝে মাঝে বান্দা কোন কোন স্তরে সাদেক আর কোন কোন স্তরে সাদেক নয়। যে সব মকামে সাদেক, তাতে যথার্থই সিদ্দীক। আবু বকর ওররাফ বলেন ঃ সিদক তিন প্রকার— তাওহীদে সিদক, এবাদতে সিদক এবং মারেফতে সিদক। তাওহীদে সিদক সাধারণ মুমিনদেরও অর্জিত হয়। যেমন, আল্লাহ বলেন—

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰۤئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ -

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও রসূলগণের প্রতি ঈমান আনে, তারা সাদেক।

এবাদতে সিদক আলেম ও পরহেযগারদের অর্জিত হয়। আর মারেফতে সিদক ওলীগণ অর্জন করেন।

অষ্টম অধ্যায়

মুরাকাবা ও মুহাসাবা

(ধ্যানমগ্নতা ও আত্মবিশ্লেষণ)

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ

অর্থাৎ, আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের মানদণ্ড স্থাপন করব। অতঃপর কারও প্রতি সামান্যও যুলুম করা হবে না। যদি সরিষার দানা পরিমাণও আমল থাকে, আমি তা উপস্থিত করব। হিসাব করার জন্যে আমিই যথেষ্ট।

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا -

অর্থাৎ, আমলনামা রাখা হবে। তখন আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন, তারা আমলনামায় লিখিত বিষয়বস্তুর কারণে ভীত হচ্ছে। তারা বলবে ঃ হায় আমাদের দুর্ভোগ, এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন পাপই সন্নিবেশিত না করে ছাড়ে না। তারা যা কিছু করেছিল সমস্তই উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি যুলুম করবেন না।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ -

অর্থাৎ, যে দিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, অতঃপর তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম বলে দিবেন। আল্লাহ তা গণনা করে রেখেছেন এবং তারা ভুলে গেছে। প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর দৃষ্টির সামনে উপস্থিত।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ -

অর্থাৎ, সেই দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বেরিয়ে আসবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। অতঃপর কেউ অণু-পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু-পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ, অতঃপর পুরোপুরি দেয়া হবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যা সে উপার্জন করেছে। তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا وَّيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ -

অর্থাৎ, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভালমন্দ কৃতকর্মকে উপস্থিত পাবে। সে আকাঙ্ক্ষা করবে, যদি তার মধ্যে ও তার কৃতকর্মের মধ্যে দূরবর্তী ব্যবধান থাকত। আল্লাহ নিজে থেকে তোমাদের সাবধান করেন।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ -

অর্থাৎ, জেনে নাও, আল্লাহ তোমাদের অন্তরস্থিত বিষয় জানেন, সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় কর।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু থেকে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মনীষীগণ জেনে নিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ

অবশ্যই নেবেন এবং কিয়ামতের দিন বান্দা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তারা এ কথাও উপলব্ধি করেছেন যে, এই বিপদ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে সর্বদা আত্মবিশ্লেষণ করা, নিজের অবস্থার পুরোপুরি দেখাশুনা করা এবং কিয়ামতে হিসাব নেয়ার পূর্বে নিজেই নিজের নফসের হিসাব নেয়া। কেননা, যে ব্যক্তি এরূপ করবে, কিয়ামতে তার হিসাব হাল্‌কা হবে। সে জওয়াব দিতে সক্ষম হবে এবং তার পরিণাম শুভ হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেই নিজের নফসের হিসাব নেবে না, সে সর্বদা পরিতাপ করবে এবং তার কুকর্ম তাকে লাঞ্ছনা ও গযবে নিপতিত করবে। আল্লাহ তা'আলা সবর ও দেখাশুনা করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا -

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা সবর কর, সবরে থাক দৃঢ় এবং দেখাশুনা করতে থাক।

এসব কারণে বুযুর্গগণ মুহাসাবা তথা আত্মবিশ্লেষণের পথ বেছে নিয়েছেন। নিম্নে এই মুহাসাবা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

নফসের প্রতি শর্ত আরোপ করা ঃ যারা দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং ব্যবসার কাজে শরীক হয়, তাদের সবার উদ্দেশ্য থাকে হিসাবের পর কিছু মুনাফা অর্জন করা। ব্যবসায়ী ব্যক্তি তার শরীকের সাহায্য গ্রহণ করে এবং তার হাতে অর্থ অর্পণ করে। ব্যবসায়ের পর সে তার শরীকের সাথে হিসাব করে এবং মুনাফা গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে আখেরাতের পথে ব্যবসায়ী হচ্ছে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং তার মুনাফা হচ্ছে নফসকে পবিত্র ও শুদ্ধ করা। আখেরাতের সাফল্য এর উপরই নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا -

অর্থাৎ, যে নফ্‌সকে পবিত্র ও শুদ্ধ করে, সে সফল হয়। আর যে নফসকে ধূলি ধূসরিত করে, সে ব্যর্থ হয়।

আখেরাতের ব্যবসায়ে জ্ঞান-বুদ্ধি নফসের সাহায্য গ্রহণ করে। অর্থাৎ, তাকে এমন কাজে নিয়োজিত করে, যা দ্বারা সে পবিত্র ও শুদ্ধ হয়। দুনিয়ার কারবারে ব্যবসায়ী শরীকের প্রতি প্রথমে কিছু শর্ত আরোপ করে,

অতঃপর সেগুলো পালিত হয় কিনা, তার দেখাশুনা করে। তেমনিভাবে জ্ঞানবুদ্ধিও নফসের সাথে চারটি বিষয়ের মুখাপেক্ষী থাকে ঃ (১) প্রথমে তার প্রতি কিছু শর্ত আরোপ করা। অর্থাৎ, কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেয়া যে, এগুলো মেনে চলতে হবে। (২) প্রতি মুহূর্তে অব্যাহতভাবে নফসের দেখাশুনা করা। কেননা, নফসকে বল্গাহীন উটের মত ছেড়ে দিলে তার কাছ থেকে কর্তব্যে অবহেলা ও খেয়ানত ছাড়া অন্য কিছু আশা করা যায় না। এমতাবস্থায় মুনাফা দূরের কথা, পুঁজি রক্ষা করাই কঠিন হবে। (৩) দেখা-শুনার পর নফসের কাছ থেকে চুলচেরা হিসাব নিতে হবে এবং এতে কঠোরতা অবলম্বন করা জরুরী। (৪) হিসাবের পর যদি মুনাফার পরিবর্তে লোকসান দেখা যায়, তবে নফসকে শাস্তি দিতে হবে।

অতএব, ঈমানদার বান্দা যখন ভোরে ঘুম থেকে উঠে এবং ফজরের নামায পড়ে নেয়, তখন কিছু সময় নিজের নফসের সাথে শর্ত করার জন্যে মনকে প্রস্তুত করে নেবে। যেমন, ব্যবসায়ী মূলধন সোপর্দ করার আগে নিজের শরীকের সাথে শর্ত করার জন্যে একান্তে বসে যায়। অন্য কাউকে এই মজলিসে আসতে দেয় না, যাতে শরীক শর্তগুলো উত্তমরূপে বুঝে নিতে পারে এবং অন্য কথায় চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত না হয়। এরপর নিজের নফসকে এভাবে বলবে— আমার এই আয়ুই আমার পুঁজি। এটা বিলুপ্ত হয়ে গেলে মূলধনই খতম হয়ে যাবে এবং ব্যবসা ও মুনাফার কোন আশা থাকবে না। আজকের এই দিনে আল্লাহ তা'আলা আমাকে সময় দিয়েছেন এবং আমার মৃত্যু বিলম্বিত করেছেন। অতএব, এ দিনটিকে বিনষ্ট করো না। মনে রেখ, হাদীসে বলা হয়েছে— বান্দার দিবারাত্রিতে চব্বিশটি ভাণ্ডার এক কাতারে সাজানো হয়। তন্মধ্যে একটি ভাণ্ডার তার জন্যে খোলা হয়। সে সেটাকে পুণ্যকর্মের নূর দ্বারা পরিপূর্ণ দেখতে পায়। এটা সেই সময়, যাতে সে সৎকর্ম করে। এটা দেখে বান্দার এত আনন্দ ও খুশী হয় যে, এই খুশী দোযখীদের মধ্যে বন্টন করে দিলে তাদের কোন কষ্টই অনুভূত হবে না। আর যে মুহূর্তে বান্দা পাপকর্ম ও আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে,সে মুহূর্তের ভাণ্ডারও খোলা হয়। সেটা কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্ধকার তাকে ঘিরে ফেলে। এ ভাণ্ডারটি দেখার পর বান্দার মধ্যে এত ভয় ও আতংক দেখা দেয় যে, এ আতংক জান্নাতীদের মধ্যে ভাগ করে দিলে তাদের সুখ ও শান্তি বিলীন হয়ে যাবে। বান্দার জন্যে আরও একটি ভান্ডার খোলা হয়, যা

থাকে শূন্য। এতে না খুশীর বিষয় থাকে, না দুঃখের। এটা সেই মুহূর্ত, যাতে বান্দা ঘুমিয়ে অথবা গাফেল থাকে অথবা দুনিয়ার মোবাহ তথা অনুমোদিত কর্মে মশগুল থাকে।

ভাণ্ডারটি দেখে বান্দা অনুতাপ করে, হায়! এটা কেন শূন্য রইল! এতে তার এত ক্ষতি হয়, যা কোন বড় সাম্রাজ্য হারিয়ে যাওয়ার ক্ষতি অপেক্ষা কম নয়। এমনিভাবে প্রাত্যহিক চব্বিশ ঘন্টার ভাণ্ডার বান্দার সমগ্র জীবনে খোলা হতে থাকে। অতএব, বান্দা নিজের নফসকে বলবে— আজ অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সহকারে নিজের ভাণ্ডারসমূহ পূর্ণ করে নাও। এরপর চোখ, কান, জিহ্বা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে নফসকে উপদেশ দেবে। কেননা, এগুলো এ ব্যবসায়ে নফসের খাদেমের অনুরূপ। এই ব্যবসায়ের তৎপরতা তাদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সুতরাং নফসকে এভাবে নির্দেশ দেবে যে, এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী থেকে হেফাযতে রাখবে। চোখকে গায়র মাহরামের দিকে দেখা থেকে, কোন মুসলমানের গুপ্ত অঙ্গের দিকে দেখা থেকে এবং তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা থেকে বাঁচাবে। এসব বিষয় থেকে চোখকে বিরত রাখার পর এমন বিষয়ে লাগাতে বলবে, যা এই ব্যবসায়ে লাভদায়ক এবং যার জন্যে চোখ সৃষ্ট হয়েছে। যেমন, শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলার আশ্চর্য কারিগরীকে দেখা, সৎকর্মসমূহের প্রতি লক্ষ্য করা, কোরআন ও হাদীস দেখা এবং জ্ঞানার্জনের জন্যে বই-পুস্তক অধ্যয়ন করা ইত্যাদি। এভাবে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে উপদেশ দেবে। বিশেষত জিহ্বা ও পেট সম্পর্কে অধিক জোর দিয়ে বলবে। কেননা, জিহ্বার ত্রুটিসমূহ— যেমন গীবত করা, মিথ্যা বলা, অপরের দোষ বলা, শত্রুর প্রতি অভিসম্পাত করা, বদ দোয়া দেয়া, ঝগড়া-বিবাদ করা ইত্যাদি খুবই অনিষ্টকর। অথচ জিহ্বা সৃষ্টি হয়েছে যিকির, অপরকে যিকিরের উপদেশদান, শিক্ষামূলক আলাপ-আলোচনা এবং মানুষের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মিটানোর জন্যে। সুতরাং নফসের সাথে শর্ত করবে যে, সারাদিন যিকির ছাড়া অন্য কিছুর জন্যে জিহ্বা হেলাবে না। মুমিনের উপকারী কথাবার্তা যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। পেটকে জোরপূর্বক বাধ্য করবে, যাতে লোভ-লালসা ত্যাগ করে এবং হালাল রূযী আহার করে। নফসের সাথে আরও শর্ত করবে যে, বর্ণিত বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন একটির খেলাফ করলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। যেমন উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু আহার বন্ধ করে দেয়া হবে এবং দৈহিক পরিশ্রমের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া হবে।

এরপর নফসকে সেসব এবাদতের নির্দেশ দিবে, যেগুলো দিনে কয়েক বার হয়ে থাকে। অতঃপর নফল এবাদত সম্পর্কে উপদেশ দেবে। এসব শর্ত প্রত্যহ নবায়ন করতে হয়। কিন্তু মানুষ যখন এসব এবাদতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন শর্ত করার প্রয়োজন থাকে না।

নফসের সাথে উপরোক্ত রূপ শর্ত করাকে বলা হয় "মুহাসাবা কাবলাল আমল" অর্থাৎ, আমল-পূর্ববর্তী আত্মবিশ্লেষণ। মুহাসাবা কখনও আমলের পরেও হয়। বান্দা যদি সারাদিন তার সামনের আমলের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং তা কম-বেশী হল কিনা দেখে, তবে তাও মুহাসাবার অন্তর্ভুক্ত।

মুরাকাবার ফযীলত ঃ হাদীসে বর্ণিত আছে— হযরত জিবরাঈল (আঃ) একবার রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন, 'এহসান' কি? তিনি বললেন ঃ বান্দার এমন মনোভাব নিয়ে আল্লাহ তা'আলার এবাদত করা যেন সে আল্লাহকে দেখছে। যদি এই ভাব সৃষ্টি করা সম্ভবপর না হয়, তবে কমপক্ষে এমন হওয়া যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। অতএব মুরাকাবার অর্থ এবাদতের সময় এই মনোভাব হওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন এবং আমি আল্লাহকে দেখছি। শেষোক্ত ভাব সম্ভব না হলে কমপক্ষে প্রথমোক্ত মনোভাব সহকারে এবাদত করা। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ -

অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকর্ম নিয়ে তার উপর দণ্ডায়মান রয়েছেন।

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى

অর্থাৎ, সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?

হযরত ইবনুল মুবারক এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার মুরাকাবা কর। সে মুরাকাবার অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সর্বদা এমনভাবে থাক যেন তুমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখছ। আবু ওছমান মাগরেবী বলেন ঃ অধ্যাত্ম পথে মানুষ যেসব বিষয় নিজের উপর অপরিহার্য করে নেয়, সেগুলোর মধ্যে উত্তম হচ্ছে মুহাসাবা ও মুরাকাবা এবং ইলম দ্বারা আমলের শাসন।

বর্ণিত আছে, কোন এক বুযুর্গের এক তরুণ শিষ্য ছিল। তিনি তার

প্রতি অসাধারণ সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং অন্যদের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। একদিন অন্যরা আরয করল ঃ ব্যাপার কি, আপনি তার অধিক সম্মান করেন, অথচ সে বয়সে তরুণ এবং আমরা প্রবীণ! উত্তরে বুযুর্গ কয়েকটি পাখী আনিয়ে প্রত্যক শিষ্যকে একটি করে পাখী ও একটি করে ছুরি দিয়ে বললেন ঃ তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পাখী এমন জায়গা থেকে যবেহ করে আনবে, যেখানে কেউ দেখে না। অতঃপর সকল শিষ্যই নিজ নিজ পাখী যবেহ করে আনল। কিন্তু তরুণ শিষ্যটি তার পাখী জীবিতই নিয়ে এল। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি যবেহ করলে না কেন? সে বললঃ আমি এমন কোন জায়গা পেলাম না, যেখানে কেউ দেখে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সর্বত্রই আমাকে দেখেন। অতঃপর তরুণের এই মুরাকাবার ভাবটি সমস্ত শিষ্যই পছন্দ করল এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিল।

মুহাম্মদ ইবনে আলী তিরমিযী বলেন ঃ এমন সত্তার মুরাকাবা কর, যাঁর দৃষ্টি থেকে তুমি উধাও হও না। এমন সত্তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যাঁর নেয়ামত তোমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। এমন সত্তার এবাদত কর, যাঁর দিক থেকে তুমি বেপরওয়া হতে পার না এবং খুশু ও নম্রতা তাঁর জন্যে কর, যাঁর রাজত্ব থেকে তুমি বাইরে যেতে পার না।

হুমায়দ তবীল সোলায়মান ইবনে আলী (রহঃ)-কে বললেনঃ আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি গোনাহ কর, তখন তোমার মধ্যে দু'টির মধ্য থেকে যে কোন একটি ধারণা থাকে— হয় এই ধারণা থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দেখছেন। এরূপ হলে তুমি নিঃসন্দেহে দুঃসাহস কর। না হয় এই ধারণা থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দেখেন না। এরূপ হলে তুমি নিঃসন্দেহে কাফের।

ফারকাদ সন্‌জী (রহঃ) বলেন ঃ মুনাফিক এদিক-ওদিক তাকায়। যখন কাউকে দেখে না, তখন দ্রুত গোনাহের পথে পা বাড়ায়। কিন্তু সে কেবল মানুষকেই ভয় করে— আল্লাহর প্রতি লক্ষ্য করে না।

আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর সঙ্গে মক্কা যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। শেষরাতে এক জায়গায় বিশ্রামের জন্যে অবতরণ করলে পাহাড় থেকে এক রাখাল তাঁর কাছে এল। তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার ছাগপাল থেকে একটি ছাগল আমার কাছে বিক্রি কর। রাখাল আরয করল ঃ আমি

গোলাম। বিক্রি করার ক্ষমতা আমার নেই। হযরত ওমর পরীক্ষার ছলে বললেন ঃ তাতে কি, মালিককে বলে দেবে, একটি ছাগল বাঘে খেয়ে ফেলেছে। গোলাম বলল ঃ এরপর আল্লাহ তা'আলাকে কি বলব বলে দিন। তিনি তো দেখেন। হযরত ওমর কেঁদে দিলেন এবং গোলামের সাথে রওয়ানা হলেন। অতঃপর মালিকের কাছ থেকে গোলামকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমার মুরাকাবার অবস্থা তোমাকে মুক্ত করেছে। আমি আশা করি, আল্লাহ তা'আলা আখেরাতেও তোমাকে মুক্ত করবেন।

মুরাকাবার স্বরূপ ও স্তর ঃ সূফীগণের পরিভাষায় এক প্রকার মারেফত থেকে উদ্ভূত অন্তরের একটি অবস্থার নাম মুরাকাবা। এই অবস্থা থেকে কিছু আমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এবং কিছু আমল অন্তরে সৃষ্টি হয়। অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার দিকে মশগুল ও মনোযোগী থাকা। যে মারেফত থেকে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে অন্তরের যাবতীয় বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত বলে জানা। এই মারেফত যখন নিশ্চিত ও সংশয়মুক্ত হয়ে যায়, তখন অন্তরকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায় এবং তার সাহসিকতাকে আল্লাহর দিকে একান্তভাবে নিবিষ্ট করে দেয়।

মুরাকাবার দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর ঃ সিদ্দীকগণের মুরাকাবা। এই স্তরের অবস্থা এই যে, তখন অন্তর আল্লাহ তা'আলার প্রতাপ নিরীক্ষণে নিমজ্জিত হয়ে যায়। অতঃপর তাতে অন্য কোন কিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার অবকাশ থাকে না। এই মুরাকাবার আমল কেবল অন্তরেই সীমিত থাকে। বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিষিদ্ধ কাজ-কর্মের প্রতি দৃষ্টি দেয়া দূরের কথা, অনুমোদিত কাজকর্মের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করে না। যখন এবাদতের দিকে ধাবিত হয়, তখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায়ই ধাবিত হয়। এ কারণেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঠিক রাখার ব্যাপারে কোন প্রকার তদবীর ও চেষ্টা-চরিত্রের প্রয়োজন হয় না। সে ব্যক্তিই এরূপ হয়, যার একটি মাত্র চিন্তা থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় চিন্তা থেকে তাকে মুক্ত করে দেন। যে ব্যক্তি এ স্তরে পৌঁছে যায়, সে পরিবেশ থেকে এমন গাফেল হয়ে যায় যে, কেউ তার কাছে এলে সে টের পায় না। চোখ খোলা থাকা সত্ত্বেও তাকে দেখে না। কিছু বলা হলে বধির না হওয়া সত্ত্বেও তা শুনে না। এক বুযুর্গের ক্ষেত্রে এমনি হত। তাকে কেউ এজন্য তিরস্কার করলে তিনি বললেন ঃ তুমি যখন আমার কাছে এস, তখন আমাকে ধাক্কা দিয়ো। এটা

মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা, এর দৃষ্টান্ত সেসব মানুষের ভেতরও পাওয়া যায়, যারা রাজ-দরবারে বসে রাজার সম্মানে ডুবে থাকে। কখনও মানুষের মন পার্থিব কোন কাজের চিন্তায় এমনভাবে ডুবে যায় যে, কোথাও যাওয়ার সময় অন্যমনস্কভাবে গন্তব্যস্থল পার হয়ে এগিয়ে যায় এবং যে কাজের জন্যে যায়, তাও ভুলে যায়।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়দকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ এ যুগে আপনি এমন কোন ব্যক্তিকে জানেন কি, যে নিজের অবস্থায় বেভুল হয়ে মানুষ থেকে বেখবর হয়ে গেছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এমন কেবল এক ব্যক্তিকে জানি, যে এক্ষণি তোমাদের কাছে উপস্থিত হবে। কিছুক্ষণ পরই ওতবা ক্রীতদাস সেখানে এসে উপস্থিত হল। আবদুল ওয়াহেদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোথা থেকে এলে? সে এমন এক জায়গার নাম বলল, সেখান থেকে বাজার হয়ে আসতে হয়। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ পথে কারও সাথে কি তোমার দেখা হয়েছে? সে বলল ঃ না, আমি কাউকে দেখিনি।

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর জীবনীতে লেখা আছে— তিনি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তার ধাক্কা লেগে এক মহিলা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি এ মহিলাকে ধাক্কা দিলেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমার কাছে তো প্রাচীর ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়নি।

হযরত শিবলী (রহঃ) হযরত আবুল হাসান নূরীর কাছে গিয়ে দেখেন তিনি ঘরের এক কোণে চুপচাপ একাগ্র চিত্তে বসে আছেন। দৃশ্যত তার কোন কিছুই নড়াচড়া করছিল না। হযরত শিবলী বললেন ঃ তুমি এই মুরাকাবা ও স্থিরতা কোথায় শিখলে? তিনি বললেন ঃ আমার এখানে একটি বিড়াল ছিল। সে যখন শিকার ধরতে চাইত, তখন ইঁদুরের গর্তের কাছে ওঁৎ পেতে বসে থাকত এবং শরীরের একটি লোমও নাড়া দিত না। তার কাছ থেকে আমি এই পদ্ধতি শিখে নিয়েছি।

আবু আবদুল্লাহ ইবনে খফীক বলেন ঃ আমি আবু আলী রুদবারীর সাথে সাক্ষাত করার জন্যে মিসর থেকে রমল্লা যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। দরবেশ ঈসা ইবনে ইউনুস মিসরী আমাকে বললেন ঃ ছুর নামক স্থানে এক যুবক ও এক প্রৌঢ় ব্যক্তি মুরাকাবায় একত্রে বসে আছে। যদি তুমি তাদেরকে এক নজর দেখে নাও, তবে হয়তো তোমার উপকারই হবে।

একথা শুনে আমি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ছুরে প্রবেশ করলাম। আমার কোমরে একটি কাপড় বাঁধা ছিল, কাঁধ ছিল খোলা। মসজিদে প্রবেশ করে দু'টি লোককে কেবলামুখী বসে থাকতে দেখলাম। আমি সালাম করলে তারা উত্তর দিল না। আমি দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার সালাম করলাম; কিন্তু জওয়াব শুনা গেল না। আমি তাদেরকে সালামের জওয়াব দেয়ার জন্যে কসম দিলাম। যুবক তার নানা রঙের তালি দেয়া পোশাক থেকে মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ হে ইবনে খফীক! দুনিয়া সামান্য। সামান্য থেকেও সামান্যই রয়ে গেছে। তুমি এ সামান্য থেকে অনেক কিছু করে নাও। তোমার কাজকর্ম খুবই কম। ফলে আমাদের সাথে সাক্ষাতের অবসর পেয়েছ। এরপর সে আমার দিকে লক্ষ্য করল। আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা সবই বিলীন হয়ে গেল। এরপর যুবক মাথা নত করল। আমি তাদের কাছে রইলাম এবং যোহর ও আসরের নামায সে মসজিদেই পড়লাম। আসরের পর আমি বললাম ঃ আমাকে উপদেশ দিন। যুবক আবার মাথা তুলে বলল ঃ হে ইবনে খফীক, আমরা নিজেরাই বিপদগ্রস্ত। নসিহতের ভাষা আমাদের নেই। আমি তাদের কাছে পানাহার ও ঘুম ছাড়াই তিনদিন অবস্থান করলাম। তারাও পানাহার করল না এবং ঘুমালও না। এরপর আমি মনে মনে স্থির করলাম আমাকে কিছু উপদেশ দেয়ার জন্যে আমি তাদেরকে কসম দেব। সম্ভবত তাদের উপদেশ আমার জন্যে উপকারী হবে। আমি তাই করলাম। সেমতে যুবক মাথা তুলে বলল ঃ হে ইবনে খফীক! এরূপ ব্যক্তির সংসর্গ অবলম্বন কর, যাকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে হয়, অন্তরে তার ভীতি সঞ্চার হয় এবং যে তোমাকে অবস্থার ভাষায় উপদেশ দেয়— কথার মাধ্যমে নয়। এখন তুমি চলে যাও, আসসালাম। যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য প্রবল, তাদের মুরাকাবা এমনি হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে অন্য কোন কিছুর অবকাশ থাকে না।

মুরাকাবার দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, এমন পরহেযগারদের মুরাকাবা, যাদের অন্তরে এ বিশ্বাস নিশ্চিতরূপেই প্রবল থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার ভেতরের ও বাইরের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। কিন্তু প্রতাপের নিরীক্ষণ তাদেরকে অপ্রকৃতিস্থ করে না; বরং তাদের অন্তরে হাল ও আমলের প্রতি মনোযোগ দেয়ারও অবকাশ থাকে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাদের লজ্জা প্রবল থাকে। এ কারণেই তারা কোন কাজ করলে অনেক আস্তে-ধীরে ও ভেবেচিন্তে করে। যে কাজের ফলে কিয়ামতে

অপমান ভোগ করতে হয়, তারা তার ধারে-কাছে যায় না। যেন তারা দুনিয়াতেই আল্লাহ তা'আলাকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল বলে বিশ্বাস করে। তাই কিয়ামতের অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না।

উপরোক্ত দু'টি স্তরের পার্থক্য বাস্তব ঘটনা মাধ্যমেও জানা যায়। উদাহরণতঃ যদি কোন ব্যক্তি নির্জনে কোন কাজ করে এবং তার কাছে হঠাৎ কোন মহিলা এসে উপস্থিত হয়, তবে সে লজ্জাবশত পরিধেয় বস্ত্র ঠিকঠাক করে উত্তমরূপে বসবে। এখানে লজ্জার কারণেই সে এরূপ করবে, সম্মানের কারণে নয়। কিন্তু যদি কোন বাদশাহ অথবা বুযুর্গ তার কাছে এসে হাযির হয়, তবে সে তার সম্মানের প্রতি এমনভাবে মনোনিবেশ করবে যে, সকল কাজকর্ম ছেড়ে দেবে। এখানে লজ্জার কারণে নয়, বরং সম্মানের দিক দিয়েই এরূপ করবে। আল্লাহ তা'আলার মুরাকাবায় বান্দার স্তর এমনিভাবেই বিভিন্ন হয়।

যে ব্যক্তি মুরাকাবার স্তরে থাকে, তার প্রথমে দেখা উচিত যে মুরাকাবা সে করতে চায়, তা বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে, না নিছক খেয়ালখুশী, না শয়তানের অনুসরণ? এ বিষয়টি উদঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত মুরাকাবা করবে না। এরপর যখন খোদায়ী নূরের মাধ্যমে জানা যাবে এটা বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে, তখন মুরাকাবার উদ্যোগ নেবে। যদি জানা যায় গায়রুল্লাহর জন্যে, তবে বিরত থাকবে এবং আল্লাহর কাছে লজ্জাবশত নিজের নফসকে তিরস্কার করবে। যারা প্রথম প্রথম মুরাকাবা করে, তাদের জন্যে এ পদ্ধতিটি ওয়াজেব ও অপরিহার্য। হাদীসে আছে, বান্দার প্রতিটি কাজে তা সামান্য হলেও তিনটি দফতর খোলা হয় এবং তাতে তিনটি প্রশ্ন থাকে। প্রথম দফতরে এ প্রশ্ন থাকে এ কাজটি কেন করলে? দ্বিতীয় দফতরে প্রশ্ন থাকে কিভাবে করলে? তৃতীয় দফতরে প্রশ্ন থাকে কার জন্যে করলে? প্রথম প্রশ্নের উদ্দেশ্য— এ কাজটি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কারণে করেছ, না কেবল মনে চেয়েছে তাই করেছ?

যদি প্রথম প্রশ্নের জওয়াব সঠিক হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে— এ কাজ কিভাবে করেছ? অর্থাৎ, নিশ্চিত সজ্ঞানে করেছ, না মূর্খতা সহকারে, না অনুমানের মাধ্যমে? যদি এ প্রশ্নের জওয়াবও শুদ্ধ হয়, তবে তৃতীয় প্রশ্ন হবে— এ কাজ কার জন্যে করেছ? অর্থাৎ, এখলাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি আল্লাহর জন্যে করে থাক, তবে তার পুরস্কার আল্লাহ তা'আলা দেবেন। আর যদি মানুষকে দেখানোর জন্যে করে থাক, তবে মানুষের

কাছেই এর পুরস্কার চাও। আর যদি দুনিয়া পাওয়ার জন্যে করে থাক, তবে তা আমি তোমাকে দুনিয়াতেই দিয়ে ফেলেছি। আর যদি ভুলক্রমে করে থাক, তবে সওয়াব খতম এবং আমল বরবাদ হয়েছে। আর যদি অন্য উপাস্যের জন্যে করে থাক, তবে আযাব ও গযবের যোগ্য হয়েছ। কারণ তুমি আমার বান্দা ছিলে, আমার দেয়া রিযিক খেয়েছিলে এবং আমার নেয়ামত ভোগ করেছিলে। এরপর অন্যের জন্যে কাজ করার অর্থ কি? তুমি কি আমার একথা শুননি—

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ -

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের এবাদত কর, তারাও তো তোমাদের মতই আমার বান্দা।

মুহাসাবার ফযীলত ঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ -

অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির দেখা উচিত, সে আগামীকালের জন্যে কি অগ্রে পাঠিয়েছে।"

এখানে অতীত আমলসমূহের হিসাব নেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন ঃ তোমার কাছ থেকে হিসাব নেয়ার পূর্বে তুমি তোমার নফসের কাছ থেকে হিসাব নাও এবং তোমার পরীক্ষা নেয়ার পূর্বে তুমি তার পরীক্ষা নাও। এক হাদীসে আছে— বুদ্ধিমানের জন্যে চারটি মুহূর্ত থাকা উচিত। তন্মধ্যে একটি মুহূর্ত নফসের হিসাব নেয়ার জন্যে থাকা দরকার। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

وَتُوْبُوْٓا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই তওবা কর, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।

বলা বাহুল্য, গোনাহ্ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর সেটিকে অনুশোচনার দৃষ্টিতে দেখার নামই তওবা। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

انى لاستغفر الله واتوب اليه فى اليوم مأة مرة -

অর্থাৎ, আমি দৈনিক একশ' বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করি।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَاهُمْ مُّبْصِرُوْنَ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদেরকে যখন শয়তান স্পর্শ করে অমনি সচকিত হয়ে যায়। এরপর তাদের চোখ খুলে যায়।

হযরত ওমর (রাঃ) রাত হলে নিজের পায়ে দুররা দিয়ে আঘাত করতেন এবং নফসকে বলতেন, আজ তুই কি কি করেছিস? মায়মূন ইবনে মেহরান বলেন ঃ বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকী হয় না— যে পর্যন্ত সে নফসের হিসাব এমনভাবে না নেয়, যেমন ব্যবসায়ে শরীকের কাছ থেকে নেয়া হয়। হযরত ইবনে সালাম (রাঃ) একবার খড়ির বোঝা মাথায় তুলে নিলে এক ব্যক্তি আরয করল ঃ এ কাজের জন্যে তো আপনার গোলামই ছিল। তিনি বললেন ঃ আমার নফস এটা খারাপ মনে করে কি না আমি তাই পরীক্ষা করছিলাম।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ মুমিন তার নফসের ব্যবস্থাপক হয়ে থাকে। আল্লাহর ওয়াস্তে সে তার কাছ থেকে হিসাব নেয়। কিয়ামতে তাদের হিসাব হালকা হবে, যারা দুনিয়াতে নিজের নফসের কাছ থেকে হিসাব নেয়।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন— একদিন আমি হযরত ওমরের সাথে বাইরে বের হলাম। তিনি এক বাগানে চলে গেলেন। আমার ও তার মধ্যে একটি প্রাচীরের আড়াল ছিল। আমি তাঁকে বাগানে একথা বলতে শুনলাম ঃ কি চমৎকার, ওমর ইবনে খাত্তাব এখন আমীরুল মুমিনীন। আল্লাহর কসম, তুই আল্লাহকে ভয় করতে থাক। অন্যথায় আল্লাহ অবশ্যই তোকে আযাব দেবেন।

আহ্নাফ ইবনে কায়সের কোন এক শিষ্য বর্ণনা করেন— আমি আমার শায়খের সাথে থাকতাম। তিনি রাতের বেলায় নামাযের জায়গায় বসে অধিকাংশ সময় দোয়া করতেন এবং বাতির কাছে গিয়ে তার শিখায় নিজের আঙ্গুল রাখতেন। যখন তীব্র উত্তাপ অনুভূত হত, তখন নফসকে বলতেন— তুই অমুক দিন অমুক কাজ কেন করেছিলে?

আমলের পর আত্মবিশ্লেষণ ঃ নফসের সাথে শর্ত করার জন্যে দিনের শুরুতে যেমন একটি মুহূর্ত নির্দিষ্ট করা দরকার, তেমনি দিনের শেষেও একটি মুহূর্ত নির্দিষ্ট করা জরুরী। তাতে বান্দা তার সারাদিনের আমলের হিসাব নফসের কাছ থেকে গ্রহণ করবে। দুনিয়াতে ব্যবসায়ী ব্যক্তি তার শরীকদের কাছ থেকে বছরের শেষে অথবা মাসের শেষে অথবা দিনের শেষে এমনি ধরনের হিসাব নিয়ে থাকে, যাতে দুনিয়ার অর্থকড়ি বিনষ্ট না হয়ে যায়। অথচ দুনিয়ার অর্থকড়ি বিনষ্ট হয়ে গেলে প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ীর জন্যে উত্তম। বিনষ্ট না হয়ে পাওয়া গেলেও তা একান্ত ক্ষণস্থায়ী বস্তু। ধ্বংসশীল বস্তুর জন্যে মানুষ যখন এতটুকু ঝামেলা পোহায়, তখন চিরন্তন সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, তার হিসাব মানুষ নিজের নফসের কাছ থেকে কেন নিবে না?

শরীকের সাথে হিসাব-কিতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমে পুঁজি ঠিক আছে কি না যাচাই এবং লাভ-লোকসান কতটুকু হয়েছে, তা দেখা। কিছু লাভ হলে তা নেয়া এবং তার কৃতিত্বের জন্যে ধন্যবাদ দেয়া। আর যদি লোকসান হয়, তবে ভবিষ্যতের জন্যে তার ক্ষতিপূরণ করা। এমনিভাবে ধর্মে-কর্মে বান্দার পুঁজি হচ্ছে ফরয কর্মসমূহ, লাভ নফল ও মোস্তাহাব কর্মসমূহ এবং লোকসান গোনাহখাতা। এ ব্যবসায়ের সময়-কাল হচ্ছে সমস্ত দিন এবং এর পরিচালক হচ্ছে নফসে আম্মারা তথা কুকর্মের আদেশকারী রিপু। সুতরাং প্রথমে তার কাছ থেকে ফরয কর্মসমূহের হিসাব নেয়া উচিত সে তা যথাযথ আদায় করেছে কি না। করে থাকলে আল্লাহর শোকর করে নফসকে উৎসাহ দেয়া উচিত যেন সে এমনি করে। আর যদি ফরয আদায় না করে থাকে, তবে তার কাছে এগুলোর কাযা দাবী করা উচিত। অসম্পূর্ণরূপে আদায় করে থাকলে নফল দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

আর যদি নফস গোনাহ করে থাকে, তবে তাকে শাস্তি দেয়ার কাজে মশগুল হতে হবে, যাতে সে কৃত গোনাহের ক্ষতি উত্তমরূপে পূরণ করে নিতে পারে। দুনিয়ার হিসাবে যেমন কড়াগণ্ডা খুঁজে বের করা হয়, তেমনি নফসের বেলায়ও করা দরকার। নফসের আত্মসাৎ ও প্রতারণা থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকা উচিত। নফস অত্যন্ত প্রতারক ও ধোকাবাজ। সুতরাং তার কাছ থেকে সারাদিনের কথাবার্তার সঠিক জওয়াব চাইবে। এমনিভাবে দৃষ্টি, চিন্তাভাবনা, উঠাবসা, পানাহার ও নিদ্রার হিসাব নিতে হবে। এমনকি, চুপ থাকারও জওয়াব চাইতে হবে যে, কেন চুপ রইল। এভাবে এক এক দিনের হিসাব নেয়ার পর সারা জীবনের দিন ও মুহূর্তসমূহের হিসাব নিতে হবে। সেমতে সূবা ইবনে সাম্মার জীবনীতে লেখা আছে যে, তিনি রিক্কা নামক স্থানে বাস করে নিজের নফসের হিসাব নিতেন। একদিন তিনি নিজের বয়স হিসাব করে দেখলেন ষাট বছর পূর্ণ হয়েছে। ষাট বছরের দিন হিসাব করে একুশ হাজার ছ'শ' দিন পেলেন। এরপর তিনি হঠাৎ এক চিৎকার করে বললেন ঃ হায়! আমি একুশ হাজার ছ'শ' গোনাহ নিয়ে রাব্বুল আলামীনের সামনে হাযির হব! যদি দৈনিক দশটি গোনাহ করে থাকি, তবে আমার কি উপায় হবে! এরপর তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল তিনি ওফাত পেয়েছেন। এমনিভাবে প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের হিসাব করবে। যদি মানুষ প্রত্যেক গোনাহের পর একটি কংকর নিজের ঘরে রেখে দেয়, তবে অল্পদিনেই তার ঘর কংকরে ভর্তি হয়ে যাবে। মানুষ অনেক গোনাহ করে, কিন্তু তা স্মরণ রাখার ব্যাপারে তার শৈথিল্যের অন্ত নেই। অথচ তার দুই কাঁধে বসে দুই ফেরেশতা নিরন্তর তার গোনাহসমূহ লিখে যায়। সেমতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ অর্থাৎ, আল্লাহ তা গুনে রাখেন, অথচ মানুষ তা ভুলে যায়।

ক্রটির পর নফসের শাসন ঃ নফসের হিসাব নেয়ার পর যদি দেখা যায়, নফস চেষ্টা সত্ত্বেও অপরাধ ও ক্রটি থেকে মুক্ত হতে পারেনি, তবে তাকে ঢিলা ছেড়ে দেবে না। কেননা, ঢিলা ছেড়ে দিলে একের পর এক গোনাহ করা তার জন্যে সহজ হয়ে যাবে। গোনাহের প্রতি তার এমন আকর্ষণ সৃষ্টি হবে— যা থেকে ফিরে আসা কঠিন হয়ে যাবে। আর তাই হবে তার ধ্বংসের কারণ। বরং এমতাবস্থায় নফসকে শাস্তি দিতে হবে। উদাহরণতঃ যদি কামনার তাড়নায় কোন সন্দেহযুক্ত লোকমা খেয়ে ফেলে, তবে উদরকে ক্ষুধার শাস্তি দেবে। যদি পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকে, তবে চোখকে কিছু দেখতে দেবে না। এমনিভাবে প্রত্যেক অঙ্গের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করবে। অধ্যাত্ম পথের পথিকদের এটাই ছিল রীতি। সেমতে মনসুর ইবনে ইবরাহীম জনৈক আবেদের অবস্থা লিখেন যে, সে এক মহিলার সাথে কথাবার্তা বলল। এরপর ক্রমান্বয়ে তার উরুর উপর

হাত রাখল। এরপরই সে অনুতপ্ত হয়ে নিজের হাত আগুনে রেখে দিল। ফলে তা জ্বলে-পুড়ে কাবাব হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে, বনী-ইসরাঈলের এক ব্যক্তি দীর্ঘকাল যাবত তার এবাদতখানায় এবাদত করছিল। একদিন সে বাইরের দিকে তাকিয়ে এক মহিলাকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। তার মনে কুবাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে মহিলার কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের পা এবাদতখানার বাইরে রাখল। অমনি আল্লাহর রহমত তার সাহায্যে এগিয়ে এল। তার মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিল এবং সে মনে মনে বলতে লাগল ঃ আমি একি করছি! অতঃপর সে নিজের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে পা এবাদতখানার ভেতরে নিতে চাইল। সে ভাবতে লাগল, যে পা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর জন্যে বাইরে এসেছিল, সে আবার আমার সাথে এবাদতখানায় কিরূপে যাবে? আল্লাহর কসম, তা হতে পারে না। অতঃপর সে তার পা বাইরেই রেখে দিল। বৃষ্টি, বরফ, বাতাস ও রৌদ্র লেগে লেগে এক সময় সে পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তার এই তওবা কবুল করলেন এবং তার কথা পরবর্তী আসমানী কিতাবে উল্লেখ করলেন।

বর্ণিত আছে, হযরত গযওয়ান ও হযরত আবু মূসা এক সাথে কোন এক জেহাদে উপস্থিত ছিলেন। এক মহিলা আত্মপ্রকাশ করলে গযওয়ান তার দিকে তাকালেন। এরপর হাত তুলে আপন চোখে সজোরে আঘাত করলেন। ফলে চোখ ফুলে গেল। তিনি চোখকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ তুই এমন বস্তুর দিকে দেখিস, যা তোর জন্যে ক্ষতিকর।

মালেক ইবনে যয়গম বর্ণনা করেন, একদিন রেমাহ কায়সী আসরের পর আমাদের বাড়ীতে এসে আমার পিতার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম ঃ তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন ঃ এ সময়ে ঘুম! এখন কি ঘুমের সময়! অতঃপর তিনি প্রস্থান করলেন। আমি তার পেছনে এক ব্যক্তিকে এই বলে পাঠালাম যে, আপনি বললে আমরা তাকে জাগিয়ে দেই। লোকটি ফিরে এসে বললঃ তিনি তো ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করার ফুরসত তার ছিল না। অতঃপর আমি তাকে দেখতে ছুটলাম। দেখলাম তিনি কবরস্তানে রয়েছেন এবং নিজের নফসকে ধিক্কার দিয়ে বলছেন— তুই একথা কেন বললি যে, এ কি ঘুমের সময়? একথা বলা তোর জন্যে কি জরুরী ছিল? মানুষ যখন ইচ্ছা ঘুমাবে। তুই

কে? তুই কি জানিস তা ঘুমের সময় কি না? খবরদার! আমি আল্লাহ তাআলার সাথে পাকা অঙ্গীকার করছি, যা কোনদিন ভঙ্গ করব না। আমি এক বছর পর্যন্ত ঘুমের জন্যে মাটিতে কোমর লাগাব না— যদি কোন অসুখ-বিসুখ অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটে। নির্লজ্জ কোথাকার, তুই কতদিন অন্যকে শাসন করবি এবং নিজে গোনাহ থেকে বিরত হবি না? তিনি এসব কথা বলে কেঁদে যাচ্ছিলেন। তার খবরই ছিল না যে, আমিও সেখানে রয়েছি। এই অবস্থা দেখে আমি তাকে তেমনি রেখে চলে এলাম।

তামীম দারেমী এক রাতে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং তাহাজ্জুদের জন্যে জাগতে পারলেন না। তিনি নফসকে এর শাস্তি এই দিলেন যে, এক বছর পর্যন্ত অনবরত রাত্রি জাগরণ করলেন এবং নিদ্রাকে হারাম করে নিলেন।

হযরত তালহা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি একদিন বস্ত্র খুলে গ্রীষ্মকালে কংকরের উপর খুব গড়াগড়ি করল। সে তার নফসকে বলছিল— হে রাতের মৃত এবং দিনের অকর্মণ্য! এখন মজা দেখ। জাহান্নামের উত্তাপ এর চেয়েও অনেক বেশী। ইতিমধ্যে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর উপর লোকটির নজর পড়ল। তিনি একটি গাছের ছায়ায় বসে ছিলেন। সে সেখানে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ আমার নফস আমার উপর প্রবল হয়ে গেছে। তিনি এরশাদ করলেন ঃ যে চিকিৎসা তুমি করেছ, এছাড়া কোন উপায় ছিল না। জেনে নাও, তোমার জন্যে আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেছেন। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের এই ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু পাথেয় নিয়ে নাও। এরপর চারদিক থেকে তাকে বলা হল ঃ মিয়াঁ, আমাদের জন্যেও দোয়া করো। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তাদের সকলের জন্যে দোয়া কর। লোকটি বলল ঃ ইলাহী, তাকওয়াকে তাদের পাথেয় বানাও এবং হেদায়েতের উপর সবাইকে সংহত কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ইলাহী, তুমি তাকে সরল পথে রাখ।

ইবনে সেমাক (রহঃ) হযরত দাউদ তাঈর খেদমতে তখন পৌছেন, যখন তাঁর ওফাত হয়ে যায়। তার লাশ তখনও ঘরেই রাখা ছিল। তিনি চোখ দেখে বললেন ঃ হে দাউদ! তুমি কয়েদী হওয়ার পূর্বেই নিজের নফসকে কয়েদী করেছ এবং আযাবপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাকে আযাব দিয়েছ। যে সত্তার জন্যে তুমি এ কাজ করতে, আজ দেখবে তিনি তোমাকে কেমন বিপুল সওয়াব দান করেন!

মুহাম্মদ ইবনে বিশর দাউদ তাঈকে দেখলেন, রোযার ইফতারের পর তিনি পানসে রুটি খাচ্ছেন। তিনি আরয করলেন ঃ আপনি লবণ দিয়ে রুটি খেয়ে নিন। দাউদ তাঈ বললেন ঃ আমার নফস দশদিন ধরে লবণ খেতে চায়। কিন্তু দাউদ যতদিন দুনিয়াতে থাকবে লবণের স্বাদ গ্রহণ করবে না। মোটকথা, সাবধানী ব্যক্তিবর্গ নফসকে এমনিভাবে সাজা দিতেন।

মোজাহাদা ঃ এর অর্থ চেষ্টা, পরিশ্রম ও সাধনা। গোনাহ ও ত্রুটির কারণে নফসকে উপরোক্ত রূপে সাজা দেয়ার পর দেখবে, নফস কোন মুস্তাহাব কাজে অথবা ওযীফায় অলসতা করে কি না। যদি অলসতা করে, তবে তার শাসন হল, ওযীফার বোঝা তার উপর চেপে দেয়া এবং অতীত ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্যে কয়েক প্রকারের ওযীফা তার জন্যে অপরিহার্য করা। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এভাবেই আমল ও মোজাহাদা করতেন। সেমতে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর যখন জামাত কাযা হয়ে যেত, তখন তিনি সারা রাত জেগে নফল এবাদত করতেন। একবার মাগরিবের নামাযে এতটা বিলম্ব হয়ে যায় যে, সন্ধ্যা তারা দেখা যেতে থাকে। তিনি এ কারণে দু'টি গোলাম মুক্ত করে দেন। ইবনে আবী রবীআর ফজরের সুন্নত কাযা হয়ে গেলে তিনি একটি গোলাম মুক্ত করে দেন। কোন কোন বুযুর্গ নিজের উপর সারা বছরের রোযা অথবা পদব্রজে হজ্জ অথবা সমুদয় সম্পদ সদকা করে দেয়া জরুরী করে নিতেন।

এখানে প্রশ্ন হল, যদি নফস সার্বক্ষণিক ওযীফার সাধনা করতে প্রস্তুত না হয়, তবে তার প্রতিকার কি? জওয়াব এই যে, হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত মোজাহাদাকারীগণের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব নফসকে শুনাতে হবে। সর্বাধিক উপকারী প্রতিকার হচ্ছে, যে ব্যক্তি এবাদতে খুব মোজাহাদা করে, তার সংসর্গে থাকা, তার অবস্থা দেখা এবং অনুসরণ করা। জনৈক বুযুর্গ বলতেন, এবাদতে যখন আমি কিছুটা অলসতার সম্মুখীন হতাম, তখন আমি খ্যাতনামা বুযুর্গ মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসের অবস্থা ও মোজাহাদা প্রত্যক্ষ করতাম। এক সপ্তাহ পর্যন্ত তাই করতাম। ফলে অলসতা দূর হয়ে যেত। কিন্তু এই চিকিৎসা কঠিন। কেননা, আজকাল এবাদতে মোজাহাদা করে এরূপ ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। পূর্ববর্তীদের মোজাহাদা এখন নেই। পূর্ববর্তীদের অবস্থা শোনার চেয়ে উত্তম কোন চিকিৎসা পদ্ধতি বর্তমান যুগে নেই। তাই পূর্ববর্তীদের রেওয়ায়েতসমূহ অধ্যয়ন করতে হবে। তাদের পরিশ্রম ও সাধনা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু

সওয়াব ও সুফল চিরকাল অবশিষ্ট থাকবে। যে তাদের অনুসরণ করে না, তার জন্যে বড়ই পরিতাপ।

নিম্নে আমরা মোজাহাদাকারীদের গুণাবলী উল্লেখ করব, যেগুলো পাঠ করে মুরীদের উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের অনুসরণ করে আমলে পরিশ্রম ও সাধনা অর্জিত হবে।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

رحم الله اقواما يحسبهم الناس مرضى وماهم بمرضى –

অর্থাৎ, আল্লাহ সেই সম্প্রদায়ের প্রতি রহম করুন, যাদেরকে মানুষ রুগ্ন মনে করে, অথচ তারা রুগ্ন নয়।

হযরত হাসান বলেন, এই হাদীসে রুগ্ন বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে এবাদত ও সাধনা রোগীর মত করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ –

অর্থাৎ, যারা পালন করে যা তারা পালন করে এবং তাদের অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত।

হযরত হাসান বলেন, এখানে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা সৎকর্ম সাধ্যমত সম্পাদন করার পরও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে যে, এসব আমলের মাধ্যমে তারা আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত পাবে কি না!

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন—

طوبى لمن طال عمره وحسن عمله –

অর্থাৎ, সে ব্যক্তিই সুখী, যার বয়স দীর্ঘ হয় এবং আমল সুন্দর হয়।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন ঃ আমার যে সব বান্দা মোজাহাদা ও চেষ্টা করে, তারা কেন এমন করে? ফেরেশতারা বলে— ইলাহী, তুমি তাদেরকে একটি বিষয়ের ভয় প্রদর্শন করেছ এবং একটি বিষয়ের জন্যে আগ্রহান্বিত করেছ। তাদের চেষ্টা ও সাধনা এ কারণেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দা আমাকে দেখতে পেলে

কি হবে? ফেরেশতারা আরয করে, তাহলে তাদের চেষ্টা ও মোজাহাদা আরও বেড়ে যাবে।

হযরত হাসান বলেন ঃ আমি অনেক লোককে দেখেছি এবং তাদের সাথে অবস্থান করেছি। তারা দুনিয়ার কোন বস্তু পেয়ে আনন্দিত হয় না এবং কোন বস্তু হারিয়েও দুঃখ করে না। দুনিয়া তাদের কাছে সে মাটির চেয়েও নিকৃষ্ট, যাকে তোমরা পদতলে পিষ্ট কর। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিল যে, সারাজীবন তাদের কোন কাপড় জুটেনি, কখনও স্ত্রীর কাছে কোন খাদ্যের ফরমায়েশ করেনি এবং ঘুমানোর জন্যে মাটিতে কোন কিছু বিছায়নি। এতদসত্ত্বেও আমি তাদেরকে কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী আমলকারী পেয়েছি। যেখানে রাত হত, সেখানেই তারা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যেত। মুখমণ্ডল মাটিতে রাখত এবং অশ্রুতে কপোল ভাসিয়ে দিত। তারা যখন কোন ভাল কাজ করত, তখন আনন্দিত হত এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তা কবুল করার দোয়া করত। পক্ষান্তরে যখন কোন খারাপ কাজ করত, তখন অনুতপ্ত হত এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা করার জন্যে কাকুতি-মিনতি করত। বিশ্বাস কর, তারা সব সময় এ অবস্থায়ই থাকত। তারা গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা না করে এবং মাগফেরাত ছাড়া নাজাত পায়নি অর্থাৎ, এত কিছুর পরও নাজাতের জন্যে তাদেরকে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার মাগফেরাত কামনা করতে হয়েছে।

বর্ণিত আছে, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয অসুস্থ হলে কিছু লোক তাঁকে দেখতে আসে। তাদের মধ্যে জনৈক যুবক ছিল অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ ও দুর্বল। ওমর ইবনে আবদুল আযীয তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার এই দুরবস্থা কেন? যুবক বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আরয করল ঃ আমীরুল মুমিনীন, অসুখ-বিসুখের কারণেই এই অবস্থা। তিনি এতে সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন ঃ তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, সত্য কথা বল। যুবক আরয করল ঃ সত্য এই যে, আমি দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করে দেখলাম তা তিক্ত। ফলে, দুনিয়ার সাজ-সজ্জা, আরাম-আয়েশ সবই আমার দৃষ্টিতে হেয় হয়ে গেছে। সোনা ও পাথর আমার কাছে একই রকম মনে হয়। আমার অবস্থা এই থাকে যে, আমি যেন আরশের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। মানুষকে দলে দলে জান্নাতে ও দোযখে প্রবেশ করানো হচ্ছে। এ ভয়েই সারাদিন পিপাসিত থাকি এবং সারারাত

জেগে এবাদত করি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সওয়াব ও শাস্তির সামনে আমার এই এবাদত নিতান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য বৈ নয়।

আবু নাঈম বলেন ঃ দাউদ তাঈ রুটির ক্ষুদ্রাংশসমূহ পানিতে গুলিয়ে পান করে নিতেন। রুটি খেতেন না। এ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন ঃ রুটি চিবোতে অনেক সময় লেগে যায়। পঞ্চাশটি আয়াত পাঠ করার চেয়ে বেশী সময় রুটি খাওয়ায় ব্যয় হয়ে যায়। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর বাড়ীতে এসে বলল ঃ আপনার ঘরের ছাদে একটি কাঠ ভেঙ্গে গেছে। তিনি বললেন ঃ তা হতে পারে। কারণ, বিশ বছর ধরে আমি ছাদের দিকে তাকাইনি।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ অনর্থক কথাবার্তার ন্যায় অনর্থক দৃষ্টিপাতকেও খারাপ মনে করতেন। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আযীয বলেন ঃ একবার আহমদ যরীনের কাছে আমরা সকাল থেকে আসর পর্যন্ত বসে রইলাম। কিন্তু তিনি না ডানদিকে তাকালেন, না বামদিকে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দু'টি চক্ষু দান করেছেন, যাতে বান্দা এগুলো দিয়ে তাঁর মাহাত্ম্য দর্শন করে। সুতরাং যে ব্যক্তি শিক্ষাগ্রহণ ছাড়াই দর্শন করে, তার জন্যে গোনাহ লেখা হয়।

হযরত আবু দারদা বলেন ঃ যদি তিনটি বিষয় না থাকতো, তবে আমি এক দিনের জীবনকেও ভাল মনে করতাম না— (১) দুপুরে আল্লাহর জন্যে তৃষ্ণার্ত থাকা, (২) অধিক রাতে সেজদা করা এবং (৩) এমন লোকদের সংসর্গে বসা, যারা গ্রীষ্মকালে উত্তম খোরমা বাছাই করার মত সৎকর্ম বাছাই করে। আসওয়াদ ইবনে এয়াযীদ এবাদতে মোজাহাদা করতেন। তিনি গ্রীষ্মকালে রোযা রাখতেন। ফলে, তাঁর দেহ সবুজ ও ফ্যাকাসে হয়ে যেত। আলকামা ইবনে কায়স তাঁকে বলতেন ঃ তুমি নিজের নফসকে আযাব দিচ্ছ কেন? তিনি জওয়াবে বলতেন ঃ আমি তো তাকে সম্মানিত করতে চাই। রোযার সাথে সাথে তিনি নামায এত বেশী পড়তেন যে, প্রায়ই মাটিতে পড়ে যেতেন। আনাস ইবনে মালেক ও হাসান একবার তার কাছে গিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এসব কাজের হুকুম দেননি; অর্থাৎ, এতটুকু মোজাহাদা ফরয করেননি। তুমি কেন তা কর? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি মালিকানাধীন গোলাম। মিনতি ও অসহায়তা প্রকাশ পায়— এমন কোন কাজ না করে থাকতে পারি না।

ছাবেত বানানী (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, নামায ছিল তাঁর সর্বাধিক

প্রিয় কাজ। তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করতেন— ইলাহী, যদি তুমি কাউকে কবরে নামায পড়ার অনুমতি দাও, তবে তা আমাকেই দিয়ো— যাতে আমি কবরেও নামায পড়তে পারি।

হযরত জুনায়দ (রহঃ) বলেন ঃ আমি হযরত সিররী অপেক্ষা অধিক এবাদতকারী কাউকে দেখিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল আটানব্বই বছর। কিন্তু মৃত্যুশয্যা ছাড়া তাঁকে কেউ কখনও শায়িত দেখেনি।

আবু মুহাম্মদ মাগাযেলী বলেন ঃ আবু মুহাম্মদ জারীরী (রহঃ) পূর্ণ এক বছর মক্কা মোয়াযযমায় কা'বাগৃহের খাদেম হয়ে বসবাস করেন। এ সময়ে কখনও তিনি ঘুমাননি, কথা বলেননি, স্তম্ভ অথবা প্রাচীরে হেলান দেননি এবং পা ছড়িয়ে বসেননি। একদিন আবু বকর কুত্তানী (রহঃ) তার কাছে গিয়ে সালাম করে বললেন ঃ আপনি কিসের বলে এই এতেকাফে সক্ষম হয়েছেন? তিনি বললেন ঃ যে ইলম আমার অন্তরকে পাকাপোক্ত রেখেছে, সে ইলমই আমাকে বাহ্যিক কাজে সহায়তা করেছে। এই জওয়াব শুনে কুত্তানী মাথানত করে চিন্তা করতে করতে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

বর্ণিত আছে, কিছু লোক সফরে পথ ভুলে গেল। তারা জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন এক দরবেশের কাছে গিয়ে পৌছল। দরবেশকে ডাক দিলে সে এবাদতখানা থেকে মাথা বের করে তাদের দিকে দেখল। তারা বলল ঃ পথ কোন্ দিকে? আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। দরবেশ মাথায় ইশারা করে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিল। আগন্তুকরা এর উদ্দেশ্য বুঝে নিল যে, দরবেশ মারেফতের পথ দেখাচ্ছে। তারা বলল ঃ আমরা তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করব, জওয়াব দেবে কি? দরবেশ বলল ঃ জিজ্ঞেস কর; কিন্তু বেশী নয়। কেননা, দিন পুনরায় ফিরে আসবে না এবং মৃত্যু তাড়াহুড়া করছে। তার কথাবার্তায় সবাই বিস্মিত হল। তারা বলল ঃ আসন্ন কিয়ামতে কি বিষয়ের উপর মানুষের হাশর হবে? দরবেশ বলল ঃ নিজ নিজ নিয়তের উপর। তারা বলল ঃ আমাদের কিছু উপদেশ দাও। সে বলল ঃ নিজের নফসের স্তর অনুযায়ী পাথেয় সংগ্রহ কর। উত্তম পাথেয় তা'ই, যা মকসুদ পর্যন্ত পৌছায়। এরপর তাদেরকে পথ বলে দিয়ে সে মাথা ভেতরে নিয়ে গেল।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়দ বলেন ঃ আমি এক চীন দেশীয় দরবেশের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে "ও দরবেশ" বলে ডাকলাম। সে জওয়াব দিল না। আমি দ্বিতীয়বার ডেকে জওয়াব পেলাম না। তৃতীয়বার ডাকার পর সে আমার দিকে মাথা তুলে বলল ঃ মিয়া সাব, আমি দরবেশ নই। দরবেশ সে ব্যক্তি, যে আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর সম্মান করে, তাঁর বিপদে সবর করে, তাঁর ফয়সালায় রাযী থাকে, তাঁর নেয়ামতের শোকর করে, তাঁর মাহাত্ম্যের সামনে বিনম্র হয়, তাঁর ইযযতের মোকাবিলায় হেয় থাকে, তাঁর হিসাব ও আযাব নিয়ে চিন্তা করে, দিনে রোযা রাখে, রাতে দাঁড়িয়ে এবাদত করে, দোযখের স্মরণ যাকে ঘুমাতে দেয় না। এ হচ্ছে দরবেশ। আমি তো একটি ক্ষেপা কুকুর মাত্র। আমি নিজেকে এই এবাদতখানায় আটকে রেখেছি, যাতে মানুষকে কামড় না দেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম— কি বিষয় মানুষকে আল্লাহ তা'আলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আল্লাহকে চেনার পর তারা বিমুখ কেন? সে বলল ঃ ভাই, কেবল দুনিয়ার মহব্বত ও সাজ-সজ্জা মানুষকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। দুনিয়া গোনাহ ও নাফরমানীর জায়গা। সে-ই হুশিয়ার ও সতর্ক, যে দুনিয়াকে মন থেকে দূরে নিক্ষেপ করে, আল্লাহর সামনে গোনাহ থেকে তওবা করে এবং নৈকট্যের বিষয়সমূহের প্রতি মনোযোগী হয়। হযরত ওয়ায়স করনী (রহঃ) এক রাত্রিকে বলতেন— এটা রুকুর রাত। অতঃপর সে রাতে এক রুকু করেই ভোর করে দিতেন। যখন পরের রাত আসত, তখন বলতেন— এটা সেজদার রাত। অতঃপর সে রাতও সেজদায় কাটিয়ে দিতেন।

বর্ণিত আছে, ওতবা গোলাম (রঃ) যখন তওবা করলেন, তখন পানাহারের প্রতি তার মোটেই আকর্ষণ ছিল না। তার স্নেহময়ী জননী বলতেন— বাছা, নিজের নফসের প্রতি নম্র হও। তিনি বলতেন— মা, আমি আরামই চাই। এখন সামান্য কষ্ট করে নিতে দাও। এরপর সুদীর্ঘকাল আরামই করব।

রবী' ইবনে খায়ছামের কন্যা পিতাকে জিজ্ঞাসা করত— আব্বাজান, ব্যাপার কি? সব মানুষ ঘুমায় কিন্তু আপনি ঘুমান না? তিনি বলতেন, বেটী, আমি আগুনকে ভয় করি। তার জননী পুত্রের কান্নাকাটি ও রাত্রি জাগরণের অবস্থা দেখে একদিন বলল ঃ বাছা, তুমি বোধ হয় কাউকে খুন করেছ। ফলে, এমন উদ্বিগ্ন থাক। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, মা। মা বলল ঃ কে সেই ব্যক্তি? আমি তার আত্মীয়-স্বজনকে খোঁজ করব, যাতে তারা তোমাকে মাফ করে দেয়। তোমার এই দুরবস্থা তারা দেখলে অবশ্যই দয়ার্দ্র হয়ে ক্ষমা করে দেবে। তিনি বললেন ঃ মা, সেতো আমার নফস। রবী' বলেন ঃ আমি হযরত ওয়ায়স করনী (রহঃ)-এর খেদমতে এসে তাঁকে ফজরের

নামাযের পর বসা অবস্থায় পেলাম। আমিও বসে গেলাম এবং মনে মনে বললাম, তাঁর ওযীফায় বাধা দেয়া উচিত হবে না। তিনি স্থান ত্যাগ করলেন না, এমনকি যোহর পড়লেন। যোহরের পর আসর পর্যন্ত একটানা নামায পড়তে থাকলেন। আসরের পর নিজের জায়গায় বসে গেলেন এবং মাগরিব পর্যন্ত বসে রইলেন। মাগরিবের বৈঠকে বসলেন এবং এশা পড়লেন। এরপর আবার বসে রইলেন। অবশেষে ফজরের নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে উঠে বললেন ঃ ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই এমন চক্ষু থেকে, যে চক্ষু ঘুমিয়ে পড়ে এবং এমন পেট থেকে, যে তৃপ্ত হয় না। আমি মনে মনে বললাম ঃ তাঁর কাছ থেকে আমার এতটুকুই যথেষ্ট। অতঃপর চলে এলাম।

জনৈক আবেদ বুযুর্গ বলেন ঃ আমি হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তিনি সবেমাত্র এশার নামায সমাপ্ত করেছেন। অতঃপর তিনি কি করেন, তা দেখার জন্যে আমি বসে রইলাম। তিনি নিজেকে একটি কম্বলে জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন এবং সারারাত একবারও পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন না। অবশেষে ভোর হল। মুয়াযযিন ফজরের আযান দিলে তিনি উঠে নামাযে শরীক হলেন। কিন্তু উযু করলেন না। এতে আমার মনে খটকা বাজল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি সারারাত শুয়ে ঘুমালেন। এরপরও নতুন উযু করলেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমি তো সারারাত কখনও জান্নাতের বাগ-বাগিচায় এবং কখনও দোযখের জঙ্গলসমূহে ছুটাছুটি করেছি। এমতাবস্থায় কি ঘুম আসে?

হযরত আলী (রাঃ)-এর জনৈক সহচর বর্ণনা করেন— আমি তাঁর পেছনে ফজরের নামায পড়লাম। সালাম ফিরানোর পর তিনি ডানদিকে ফিরে বসলেন। তিনি কিছুটা চিন্তান্বিত ছিলেন। সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি এভাবেই বসে রইলেন। অতঃপর বামদিকে ফিরে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীগণকে দেখেছি। আজকাল তাদের অনুরূপ কোন দ্বীনদারী দেখা যায় না। তারা ভোরবেলা মলিন, ফ্যাকাসে ও এলোকেশে গাত্রোত্থান করতেন। রাত সেজদা ও নামাযে কাটিয়ে দিতেন এবং আল্লাহর কিতাব পাঠ করতেন। যখন যিকির করতেন, তখন ঝড়ের দিনে গাছ যেমন আন্দোলিত হয়, তেমনি আন্দোলিত হতেন। তাদের চোখের অশ্রু পরনের বস্ত্র ভিজিয়ে দিত। কিন্তু আজকাল আপনারা কি করেন, সারারাত গাফেল হয়ে নিদ্রা যান।

আবু মুসলিম খওলানী তাঁর নামাযের ঘরে একটি চাবুক ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি নিজের নফসকে ভীতি প্রদর্শন করতেন। তিনি বলতেন— মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ হয়তো মনে করবেন, দ্বীনদারী কেবল তাঁরাই করে গেছেন, অন্যরা এতে তাঁদের সাথে শরীক হয়নি। আল্লাহর কসম, আমিও একাজে তাঁদের সাথে উত্তমরূপে যোগদান করব, যাতে তাঁরাও জানেন তাঁদের পেছনে কিছু লোক রয়ে গেছে।

কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন ঃ আমার নিয়ম ছিল প্রত্যহ সকালে উঠে প্রথমে আমার ফুফী আম্মা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করা। একদিন সকালে গিয়ে দেখি, তিনি চাশতের নামায পড়ছেন। নামাযে فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ আয়াতখানি বারবার পাঠ করে কাঁদছেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। তাঁর নামায ও ক্রন্দন শেষ হচ্ছিল না। বিলম্ব দেখে আমি এই মনে করে বাজারে চলে গেলাম যে, প্রথমে নিজের কাজ শেষ করে পরে এসে সালাম করে যাব। আমি কাজ শেষ করে ফিরে এসে তাঁকে পূর্ববৎ ক্রন্দনরত ও দোয়ারত অবস্থায় পেলাম।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন ঃ আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে আমার বাড়িতে অতিথি হন। হঠাৎ তাঁর একটি পা অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে এশার উযু দ্বারা ফজরের নামায পড়তেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি মৃত্যুকে মোটেই ভয় করি না; কেবল আশংকা করি, আমার তাহাজ্জুদের নামায বন্ধ হয়ে না যায়!

হযরত হাসানকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ যারা তাহাজ্জুদ পড়ে, তাদের চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বল হয় কেন? তিনি বললেন ঃ এর কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে একান্তে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে নিজ নূর থেকে কিছু নূর পরিয়ে দেন।

মোটকথা, এ হচ্ছে পূর্ববর্তী মনীষীগণের মোজাহাদা ও মুরাকাবার অবস্থা। এখন যদি তোমার নফস অবাধ্য হয় এবং এবাদতে শৈথিল্য করে, তবে তাদের অবস্থা পর্যালোচনা কর। কেননা, এধরনের লোকদের অস্তিত্ব এখন বিরল। আর যদি তাদেরকে দেখার ভাগ্য হয় এবং দেখে অনুসরণ করতে পার, তবে সোনার উপর সোহাগা। কেননা, অনুসরণের ক্ষেত্রে দেখার প্রভাব শোনার চেয়ে বেশী।

যদি তোমার নফস বলে পূর্ববর্তী মনীষীগণ তো যবরদস্ত ব্যক্তি ছিলেন, তাদের অনুসরণের সাধ্য আমাদের নেই, তবে যে সব মহিলা এবাদতে মোজাহাদা করে গেছেন, তাদের ঘটনাবলী পাঠ করে আপন নফসকে বল ঃ হতভাগা, তোর লজ্জা নেই? তুই কি অবলা মহিলাদেরও পেছনে পড়ে থাকবি? পুরুষ হয়ে দুনিয়া অথবা দ্বীনের ব্যাপারাদিতে মহিলাদের পেছনে পড়ে থাকা খুবই অপমানের কথা।

এখন আমরা মহিলাদের মধ্যে যারা মোজাহাদা করেছে, তাদের কিছু অবস্থা লিপিবদ্ধ করব।

বর্ণিত আছে, হাবীবা আদভিয়া যখন এশার নামায শেষে নিজের ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বলতেন, ইলাহী, তারকারাজি বিচ্ছুরিত হয়েছে, চক্ষুসমূহ মুদিত হয়ে গেছে, বাদশাহরা দরজা বন্ধ করে নিয়েছে এবং প্রত্যেক বন্ধু তার বন্ধুর সাথে একান্তে চলে গেছে। এমতাবস্থায় আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়েছি। এরপর তিনি নামায পড়তে থাকতেন। ফজর হয়ে গেলে বলতেন, ইলাহী, রাত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং দিন আলোকিত হয়েছে। আমি জানি না, তুমি আমার এই রাত কবুল করেছ কিনা। কবুল করার কথা জানলে নিজেকে মোবারকবাদ দিতাম। আর নামনযুর করার কথা জানলে অনুতাপ প্রকাশ করতাম। তোমার ইযযতের কসম, যতদিন তুমি আমাকে জীবিত রাখবে, এ কর্মপন্থা অব্যাহত রাখব। তুমি আমাকে নিজের দরজা থেকে ধাক্কা দিলেও আমি এতটুকুও টলব না। কেননা, আমার অন্তরে তোমার কৃপা ও দান অনেক।

আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসান (রহঃ) বলেন ঃ আমার একটি রোমীয় বাঁদী ছিল। তার প্রতি আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিলাম। একরাতে যখন সে আমার কাছে ঘুমিয়ে ছিল, তখন আমি জেগে দেখি, সে বিছানায় নেই। আমি তাকে খুঁজতে খুঁজতে মসজিদে গেলাম। দেখি, সে মাটিতে পড়ে বলে যাচ্ছে— ইলাহী, আমার প্রতি তোমার যে মহব্বত, তার ওসীলায় আমাকে ক্ষমা কর। আমি বললাম ঃ আমার প্রতি তোমার যে মহব্বত— একথা বলো না; বরং বল ঃ তোমার প্রতি আমার যে মহব্বত, তার ওসীলায় আমার গোনাহ মাফ কর। বাঁদী বলল ঃ প্রভু, তা নয়। তিনিই আমাকে মহব্বত করেন। সে কারণেই তো আমাকে শিরক থেকে বের করে ইসলাম দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন এবং আমাকে রাতের বেলায় জাগিয়ে রেখেছেন।

আবু হাশেম কারশী বলেন ঃ একবার ইয়ামনের সারিয়্যা নাম্নী এক মহিলা আমাদের ঘরে এসে অবস্থান করে। রাত হলেই আমি তার

কান্নাকাটির আওয়াজ শুনতে পেতাম। একদিন আমি আমার খাদেমকে বললাম ঃ এই মহিলাকে উঁকি দিয়ে দেখ তো সে কি করছে? সে দেখে জানতে পারল সে অনিমেষ নেত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলামুখী হয়ে বলে যাচ্ছে ঃ ইলাহী, তুমি সারিয়্যাকে সৃষ্টি করেছ, অতঃপর নিজের নেয়ামত খাইয়ে লালন-পালন করেছ এবং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রেখেছ। তোমার সকল অবস্থাই তার জন্যে কল্যাণকর। তোমার দেয়া বিপদাপদ তার ধারণায় সদ্ব্যবহার। এতদসত্ত্বেও সে নিজেকে তোমার ক্রোধের সামনে পেশ করে এবং বিনা দ্বিধায় তোমার নাফরমানী করার দুঃসাহস করে। তুমি কি জান, তার ধারণায় তার কুকর্ম তুমি দেখ না? অথচ তুমি সর্বজ্ঞাত ও সর্বশক্তিমান।

যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন ঃ একরাতে আমি কানআন উপত্যকা থেকে বের হলাম। উপত্যকার উপরে পৌঁছে দেখি, আমার সামনে দিয়ে একটি কাল বস্তু আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সে বলছে وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ এবং কাঁদছে। সে কাছে এলে জানা গেল, ছোট বালতি হাতে পশমী জোব্বা পরিহিতা এক মহিলা। সে বলল ঃ তুমি কে, আল্লাহ থেকে মুক্ত হয়ে অন্যের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ? আমি বললাম ঃ একজন পুরুষ মুসাফির। সে বলল ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আল্লাহ তা'আলা আছেন— এতদসত্ত্বেও মুসাফির হওয়ার কি অর্থ? আমি তার কথায় কেঁদে ফেললাম। সে প্রশ্ন করল ঃ কাঁদলে কেন? আমি বললাম ঃ ঔষধ এমন ব্যথার উপর পড়েছে যাতে যখম হয়ে গেছে। সে বলল ঃ তুমি সত্যবাদী হলে কান্নার কোন কারণ নেই। আমি বললাম ঃ সত্যবাদীরা কাঁদে না নাকি? সে বলল ঃ না। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ কান্না অন্তরের একটি সুখ। তার কথা শুনে আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। আমি কিছুই বললাম না।

ইবনে আলা সাদী বলেন ঃ আমার পিতৃব্য কন্যা বরীরা খুব এবাদত করত এবং কোরআন অত্যধিক তেলাওয়াত করত। সে যখন দোযখের বর্ণনা সম্বলিত কোন আয়াত পাঠ করত, তখন ভীষণ কাঁদত। অধিক কান্নার ফলে অবশেষে তার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেল। তার চাচাত ভাইয়েরা পরস্পর বলল ঃ চল, আমরা অধিক কান্নার জন্য তাকে তিরস্কার করি। সেমতে আমরা সবাই তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম ঃ বরীরা, তুমি কেমন আছ? সে জওয়াব দিল, অতিথি হয়ে অজানা ভূমিতে পড়ে আছি। কবে

ডাক পড়বে, তারই অপেক্ষায় আছি। আমরা বললাম ঃ তাহলে এই কান্না আর কতদিন চলবে? দৃষ্টিশক্তি তো রহিতই হয়ে গেছে। সে বলল ঃ যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার চোখের কোন কল্যাণ থেকে থাকে, তবে যা নষ্ট হয়েছে, তা ক্ষতি। আর যদি তার কাছে এই চোখের অনিষ্ট থেকে থাকে, তবে আরও বেশী ক্রন্দন করা দরকার। একথা বলে বরীরা মুখ ফিরিয়ে নিল। অতঃপর তার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা দেখে আমরা চলে এলাম।

খাওয়াস (রহঃ) বলেন ঃ আমরা একবার রাহেলা আবেদার কাছে গেলাম। সে রোযা রাখতে রাখতে কৃষ্ণবর্ণ, কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ এবং নামায পড়তে পড়তে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। ফলে, বসে বসেই নামায পড়ত। আমরা তাকে সালাম করে আল্লাহ তা'আলার কিছু ক্ষমাগুণ বর্ণনা করলাম, যাতে তার এবাদত সহজ হয়। সে শুনে এক বুকফাটা চিৎকার দিয়ে বলল ঃ من آنم که من دانم অর্থাৎ, আমি কে, তা আমিই জানি! এই আত্মোপলব্ধির কারণে আমার অন্তর আহত এবং কলিজা খণ্ড-বিখণ্ড। হায়, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে সৃষ্টি না করতেন এবং দুনিয়াতে আমার কথা আলোচিত না হত! একথা বলে সে নামায পড়তে লাগল।

সুতরাং তুমি যদি নিজের নফসের দেখাশুনা ও হেফাযত করতে চাও, তবে এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ও মহিলাগণের অবস্থা দেখ, যাতে তোমার মাঝেও মোজাহাদার বাসনা জাগ্রত হয়! তুমি নিজের সমসাময়িক জনগোষ্ঠীর প্রতি কখনও তাকিয়ো না। কারণ, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ, "যদি তুমি পৃথিবীবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।"

এছাড়া কাফের সম্প্রদায়কে সমসাময়িক লোকদের সাথে একাত্মতাই ধ্বংস করেছে। তারাও বলেছিল ঃ

اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ -

অর্থাৎ, আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এক ধর্মপথে পেয়েছি; আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করি।

মোটকথা, তুমি নফসকে শাসন করতে থাক এবং মোজাহাদার পথে ধাবিত হও। নফস অমান্য করলে তাকে তিরস্কার ও ধমক দাও।

নফসের শাসন ও নিন্দা ঃ মানুষের সর্ববৃহৎ শত্রু হল তার নফস। বগলের এই সর্পটি মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম থেকে পলায়ন করে। তাই মানুষ একে শুদ্ধ করতে, বল প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহর এবাদতে আকৃষ্ট করতে এবং কামনা-বাসনা থেকে আলাদা রাখতে নির্দেশিত হয়েছে। মানুষ যদি এ শত্রুর খবর না নেয়, তবে সে অবাধ্য হয়ে পলায়ন করে এবং এরপর আর বশে আসে না। পক্ষান্তরে যদি সর্বক্ষণ ভীতিপ্রদর্শন, ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে থাকে, তবে এ নফসই নফসে লাওয়ামা (তিরস্কারকারী নফস) হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা কোরআন শরীফে এরই কসম খেয়েছেন। এরপর আশা করা যায় এই নফস ক্রমান্বয়ে 'নফসে মুতমায়িন্না' (প্রশান্ত নফস) হয়ে যাবে, যাকে সৎকর্মশীল বান্দাদের মধ্যে সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন অবস্থায় আহবান করা হবে। অতএব, মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে কোন সময় নফসকে উপদেশ দান ও তাকে শাসন করা থেকে গাফেল না থাকা। অপরকে উপদেশ দেয়ার পূর্বে নিজের নফসকে উপদেশ দেবে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি এ মর্মে ওহী নাযিল করেন— হে মরিয়ম-তনয়, তুমি নিজের নফসকে উপদেশ দাও। যদি সে উপদেশ মেনে নেয়, তবে অপরকে উপদেশ দাও। অন্যথায় আমার কাছে লজ্জিত হও। আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে এরশাদ করেন—

وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ, হে নবী উপদেশ দিন। উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে।

এর পদ্ধতি হল, নফসকে সম্বোধন করে তার নির্বুদ্ধিতা, বোকামি ও মূর্খতা প্রমাণ করা। কারণ, নফস সর্বদাই নিজের বিচক্ষণতা ও হেদায়েতকে বড় করে দেখে এবং তাকে বোকা বলা হলে অসন্তুষ্ট হয়। সুতরাং এভাবে বলবে— হে নফস, তুই তো নিজকে প্রজ্ঞা, মেধা ও বুদ্ধিমত্তায় পাকাপোক্ত মনে করিস; কিন্তু তোর সমান বোকা ও স্বল্পজ্ঞানী কেউ নেই। তোর তো জানা আছে যে, জান্নাত ও দোযখ তোর সামনে রয়েছে। তন্মধ্যে যে কোন একটিতে তুই সত্বরই প্রবেশ করবি। এমতাবস্থায় তোর খুশী হওয়া, হাস্য করা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত হওয়ার কারণ কি? যে মৃত্যুকে তুই দূরে মনে করিস, আল্লাহ তা'আলার কাছে তা

নিকটবর্তী। তোর কি জানা নেই যে, মৃত্যু হঠাৎ আসে। মৃত্যু হঠাৎ না এলেও রোগব্যাধি তো হঠাৎ আসে, যা মৃত্যু পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়! তোর কি হল যে, মৃত্যু এত কাছে থাকা সত্ত্বেও তোর কোন প্রস্তুতি নেই? তুই কি নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম বুঝিস না?

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ - مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ -

অর্থাৎ, মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় নিকটবর্তী, কিন্তু তারা উদাসীনভাবে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। যখনই তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নতুন উপদেশ আসে, তখন তারা তা কৌতুকচ্ছলে শুনে। তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী।

যদি তুই মনে করিস, আল্লাহ তা'আলা তোকে দেখেন না, এজন্য তাঁর নাফরমানী করিস, তবে তুই বড় কাফের। আর আল্লাহ তোর অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত একথা বিশ্বাস করেও যদি নাফরমানী করিস, তবে তুই বড় নির্লজ্জ।

হে নফস, দেখ তোর পালনকর্তা বলেন—

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا -

অর্থাৎ, পৃথিবীর প্রতিটি জীবের রিযিক আল্লাহরই দায়িত্বে।

আখেরাত সম্পর্কে বলেন—

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى -

অর্থাৎ মানুষ যা চেষ্টা করে, কেবল তাই পায়।

এ দু'টি আয়াত থেকে জানা যায়, বিশেষত দুনিয়ার রিযিকের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন। এতে তোর চেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই। আর আখেরাতকে তোর উপার্জনের মধ্যে সীমিত রেখেছেন। কিন্তু তুই নিজের কর্মের দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিস। যে

দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন, তার জন্যে তোর চেষ্টা-চরিত্রের সীমা-পরিসীমা নেই। আর আখেরাতের বিষয়, যা তোর চেষ্টার উপর নির্ভরশীল, তাতে তোর অবহেলা ও শৈথিল্যের অন্ত নেই। এটা ঈমানের পরিচায়ক নয়। যদি মৌখিক ঈমানই গ্রহণীয় হত, তবে মুনাফিকের স্থান দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে কেন হত? হতভাগা, মনে হয় তুই হিসাব দিবসে বিশ্বাস করিস না। তোর ধারণা, মৃত্যুর পর তুই এমনিই রেহাই পেয়ে যাবি! কখনও তা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন —

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى -

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না? অতঃপর সে কি রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়নি? এরপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেছেন ও সুঠাম করেছেন। অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী। তিনি কি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম নন?

এরপর যদি তুই ধারণা করিস, তোকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে, তবে তোর মত মূর্খ কেউ নেই এবং তুই মস্ত কাফের। চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ তা'আলা তোকে কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এরশাদ হয়েছে—

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ -

অর্থাৎ, মানুষ নিপাত যাক! সে কত অকৃতজ্ঞ! আল্লাহ তাকে কি বস্তু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? বীর্য দিয়ে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তার বিকাশ ঘটিয়েছেন। অতঃপর তার জন্যে পথ সহজ করেছেন। অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে সমাহিত করেন। অতঃপর যখন ইচ্ছা তাকে পুনরুত্থিত করবেন।

হে নফস, যদি তুই আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা মনে না করিস, তবে

সাবধান হচ্ছিস না কেন? যদি কোন ইহুদী ডাক্তার তোকে বলে দেয় যে, তোর রোগে অমুক খাদ্য ক্ষতিকর, তবে সে খাদ্য তোর কাছে সর্বাধিক সুস্বাদু হলেও তুই তা ছেড়ে দিবি এবং সবর করে নিবি। এখন জিজ্ঞাস্য, যে পয়গম্বরকে আল্লাহ মোজেযা দিয়ে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, তাঁর কথা এবং ঐশী গ্রন্থে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার কথা তোর কাছে কি এক ইহুদী ডাক্তারের কথারও সমান নয়? অথচ সে বিনা প্রমাণে নিছক অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে। তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধিও অসম্পূর্ণ। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তোর অবস্থা যদি চতুষ্পদ জন্তুদের কাছে উন্মোচিত হয়, তবে তারাও না হেসে পারবে না।

হে হতভাগা, পার্থিব জীবন নিয়ে অহংকার করিস না। তুই নিজেই নিজের ব্যাপারে চিন্তা কর। হেলায় সময় নষ্ট করিস না। এ জীবন গনাগুনতি কয়েক দিনের। রুগ্ন হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে কর এবং কর্মব্যস্ততার পূর্বে অবসর মুহূর্তকে, দারিদ্রের পূর্বে প্রাচুর্যকে, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে কাজে লাগাতে শিখ। আখেরাতে যতদিন থাকতে হবে, সে পরিমাণে তার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। দুনিয়াতেও তো তাই করিস। শীতের মেয়াদ যতদিনের হয়, ততদিনেরই সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করিস। খাদ্য, পোশাক ও খড়ি সংগ্রহ করিস। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের উপর হেলান দিয়ে থাকিস না যে, তিনি জোব্বা, পশম, লাকড়ী ইত্যাদি ছাড়াই শীতের কষ্ট দূর করে দেবেন। অথচ তিনি তাও করতে সক্ষম। তুই কি মনে করিস যে, শীতকালের শৈত্যের তুলনায় জাহান্নামের ঠাণ্ডা বায়ুর স্তরে শৈত্য কম হবে? বরং দুনিয়ার শীত যেমন গরম কাপড়, আগুন ইত্যাদি ছাড়া প্রশমিত হয় না, তেমনি জাহান্নামের শীতও তাওহীদ ও আনুগত্যের লেফ ছাড়া দূর হবে না। আল্লাহ তা'আলার এই কৃপা কম নয় যে, তিনি তোকে এই শৈত্য থেকে আত্মরক্ষার উপায় বলে দিয়েছেন। এর সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন। লাকড়ী কেনা, গরম কাপড় নেয়া যেমন আল্লাহ তা'আলার কাজ নয়, তিনি এগুলোর উর্ধ্বে; বরং এসব সামগ্রী কেবল তোর আরামের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি যত এবাদত ও মোজাহাদা রয়েছে, সেগুলো থেকেও তিনি বেপরওয়া। এগুলো কেবল তোর মুক্তির জন্যে। অতএব, যে কেউ ভাল করবে, তা নিজের জন্যে এবং খারাপ করবে, তাও নিজের জন্যে। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু থেকে বেপরওয়া।

হে নফস, তুই আল্লাহ তা'আলার সওয়াব, আযাব ও কিয়ামতের ভয়ংকর অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ গাফেল। এ কারণেই মৃত্যুর প্রতি তোর ঈমান ও বিশ্বাস নেই। যদি কেউ রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করে এক দরজা দিয়ে ঢুকার পর অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার জন্যে, এরপর বিরহ নিশ্চিত জেনেও সেই প্রাসাদের কোন সুন্দর বস্তুতে সর্বান্তকরণে ব্যাপৃত হয়ে যায়, তবে সে বুদ্ধিমান হবে, না বুদ্ধির দুশমন? এমনিভাবে দুনিয়া রাজাদের রাজা আল্লাহ তা'আলার ঘর। তোকে এখানে কেবল স্বল্পক্ষণ বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখানে যত বস্তু-সামগ্রী রয়েছে, সেগুলো কারও সাথে যায় না। মৃত্যুর পর দুনিয়াতেই থেকে যায়। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

ان روح القدس نفث فى روحى احبب ماشئت فانك مفارقه

واعمل ماشئت فانك تجزى به وعش ما شئت فانك ميت -

অর্থাৎ, জিবরাঈল আমার অন্তরে একথা স্থাপন করেছেন, যে বস্তুকে ইচ্ছা মহব্বত কর, তা থেকে বিচ্ছিন্ন অবশ্যই হবে। যা ইচ্ছা আমল কর, তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে এবং যতদিন ইচ্ছা জীবন ধারণ কর, মরতে তোমাকে হবেই।

তোর কি জানা নেই, মৃত্যু পেছনে থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়, সে যখন দুনিয়া ছেড়ে যায়, তখন অনেক বেদনা সাথে নিয়ে যায়। প্রত্যেকেই বসবাসের জন্যে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে। অথচ তার থাকার জায়গা হয় ভূগর্ভস্থ কবর। দুনিয়াতে এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কি হবে? কেউ নিজের দুনিয়া আবাদ করে অথচ এখান থেকে সফর অবশ্যই করবে। কেউ নিজের আখেরাত বরবাদ করে অথচ সেখানে অবশ্যই যাবে।

নবম অধ্যায়

ফিকর ও ইবরত

(চিন্তাভাবনা ও শিক্ষা)

হাদীস শরীফে আছে— এক মুহূর্তের চিন্তাভাবনা এক বছরের এবাদত অপেক্ষা উত্তম। কোরআন পাকে শিক্ষা গ্রহণ ও চিন্তাভাবনার প্রতি অনেক উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, চিন্তা-ভাবনা খোদায়ী নূর ও আলোর চাবিকাঠি এবং অন্তর্দৃষ্টির উপায়। অনেক মানুষ চিন্তাভাবনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত; কিন্তু তারা এর স্বরূপ ও ফলাফল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। তারা জানে না চিন্তাভাবনা কেমন করে করতে হয়, কি কি বিষয়ে করতে হয় এবং কেন করতে হয়? এসব বিষয় বর্ণনা করা জরুরী। তাই আমরা প্রথমে চিন্তাভাবনার ফযীলত, অতঃপর তার স্বরূপ ও ফলাফল বর্ণনা করব। এরপর যেখানে যেখানে চিন্তাভাবনা চলে, সেসব স্থান বর্ণনা করব।

চিন্তাভাবনার ফযীলত ঃ আল্লাহ জাল্লা শানুহু কোরআন মজীদের বহু স্থানে চিন্তাভাবনার বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রশংসা করেছেন। এক জায়গায় এরশাদ হয়েছে—

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ
فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا -

অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও পার্শ্বে শায়িত অবস্থায় এবং চিন্তাভাবনা করে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি সম্পর্কে, তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করনি।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন— কিছু লোক আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলে রসূলে আকরাম (সাঃ) তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর— স্বয়ং তাঁর সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো না। কেননা, তাঁর সুউচ্চ মহিমা উদঘাটন করতে তোমরা কখনও সক্ষম হবে না।

বর্ণিত আছে, একদিন রসূলে করীম (সাঃ) কয়েকজন লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখন চিন্তাভাবনায় মশগুল। তিনি বললেন ঃ ব্যাপার কি, তোমরা কথা বলছ না কেন? তারা আরয করল ঃ আমরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছিলাম। তিনি বললেন ঃ বেশ তাই কর। স্বয়ং আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো না। এখান থেকে কাছেই একটি শুভ্র ভূখণ্ড আছে, যার আলো শুভ্র। সেখানে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট এমন সব লোক বসবাস করে, যারা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী একদম করে না। তারা আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, শয়তান তাদের কোন্ দিকে থাকে? তিনি বললেন ঃ শয়তান সৃজিত হয়েছে কি না সে কথাই তারা জানে না। তারা আরয করল ঃ তারা কি হযরত আদমের সন্তান? উত্তর হল ঃ আদম পয়দা হয়েছে কি না, তারা তাও জানে না।

আত্তার বর্ণনা করেন— একদিন আমি ও ওবায়দ ইবনে ওমায়র হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি পর্দার আড়াল থেকে আমাদের সাথে কথা বললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওবায়দ, তুমি ইদানীং আমার কাছে আসছ না কেন? ওবায়দ আরয করলেন ঃ কারণ রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন— زرغبا تزدد حبا –'বিরতি দিয়ে দিয়ে সাক্ষাৎ কর। এতে মহব্বত বৃদ্ধি পায়।' অতঃপর ওবায়দ জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি এমন কোন আশ্চর্য বিষয় বর্ণনা করুন, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে দেখেছেন। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) কেঁদে ফেললেন। অতঃপর বললেন ঃ তাঁর সব কিছুই ছিল আশ্চর্যজনক। এক রাতে তিনি আমার কাছে এলেন এবং আমার গা ঘেঁষে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর বললেন ঃ আমাকে আমার পরওয়ারদেগারের এবাদত করতে দাও। এরপর তিনি উঠে একটি মশক থেকে পানি নিয়ে উযু করলেন এবং নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযে তিনি এত কাঁদলেন যাতে শ্মশ্রু মোবারক ভিজে গেল। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন। মুয়াযযিন বেলাল ফজরের নামাযের কথা জানাতে এসে তাঁকে নামাযের বিছানায় শায়িত দেখে বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা তো আপনার অগ্র-পশ্চাৎ সমস্ত গোনাহ মোচন করে দিয়েছেন। এরপরও আপনি কাঁদেন কেন? তিনি বললেন ঃ হে বেলাল, আমি কাঁদব না কেন? আজ রাতে আমার প্রতি এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে—

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন ঃ সে ব্যক্তির দুর্ভোগ, যে এ আয়াত পাঠ করে এবং সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না।

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে বর্ণনা করেন ঃ হযরত আবু যর (রাঃ)-এর ওফাতের পর এক বসরাবাসী তার মায়ের কাছে তার এবাদত সম্পর্কে প্রশ্ন করল। হযরত আবু যরের মা বললেন ঃ সে সমস্ত দিন ঘরের কোণে বসে বসে চিন্তাভাবনা করত। হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ চিন্তাভাবনা একটি দর্পণ। তাতে মানুষের সৎকর্ম ও কুকর্মসমূহের প্রতিফলন ঘটে।'

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামকে বলা হল ঃ আপনি খুব বেশী চিন্তাভাবনা করেন, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ চিন্তাভাবনা জ্ঞান-বুদ্ধির নির্যাস।

তাউস বর্ণনা করেন— ঈসা (আঃ)-এর হাওয়ারীগণ তাঁর খেদমতে আরয করল ঃ ইয়া রূহুল্লাহ, আজ ভূপৃষ্ঠে আপনার সমান কেউ আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, যার কথাবার্তা যিকর হয় এবং চুপ থাকা ফিকর হয়, সে আমার সমান।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত সম্পর্কে চিন্তা করা চমৎকার এবাদত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক একদিন সহল ইবনে আলীকে নিশ্চুপ ও চিন্তান্বিত দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথায় পৌঁছে গেছেন? তিনি বললেন ঃ পুলসিরাতে।

আবু শোরায়হ একদিন চলতে চলতে হঠাৎ পথের মধ্যেই বসে পড়লেন এবং চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন ঃ আমার বয়স চলে যাওয়া, আমল কম হওয়া এবং মৃত্যু নিকটে এসে পড়ার চিন্তা আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল।

ইসহাক ইবনে খলফ বলেন ঃ দাউদ তাঈ জোছনা রাতে এক ছাদের উপর দাঁড়িয়ে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে কেঁদে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেখান থেকে এক প্রতিবেশীর ঘরের উপর পড়ে গেলেন। গৃহকর্তা চোর মনে করে তরবারি হাতে তাঁর দিকে দৌড়ে এল। অতঃপর দাউদকে দেখে তরবারি রেখে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনাকে ছাদের উপর থেকে কে ফেলে দিল? তিনি বললেন ঃ আমি জানি না।

হযরত জুনায়দ (রহঃ) বলেন ঃ সর্বশ্রেষ্ঠ মজলিস হচ্ছে তাওহীদের ময়দানে ফিকর সহকারে বসে মারেফতের বায়ু সেবন করা, একত্বের দরিয়া থেকে মহব্বতের পেয়ালা পান করা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুধারণা সহকারে দর্শন করা। অতঃপর বলেন ঃ এই মজলিসগুলো খুবই উত্তম এবং এই পানীয়গুলো খুবই সুস্বাদু। সুখী সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা এগুলো দান করেন।

চিন্তাভাবনার স্বরূপ ও ফলাফল ঃ ফিকরের অর্থ অন্তরে দু'টি মারেফত উৎপন্ন করা, যাতে এগুলোর সাহায্যে তৃতীয় একটি মারেফত অর্জিত হয়। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় এবং কোনরূপে একথা জানতে আগ্রহী হয় যে, দুনিয়ার তুলনায় আখেরাত অবলম্বন করা উত্তম। এখন এ জ্ঞান অর্জন করার দু'টি উপায় আছে। প্রথমত, আখেরাত যে উত্তম, একথা অপরের কাছে শুনা এবং শুনামাত্রই তা সত্য বলে মেনে নেয়া। এ উপায়ের মধ্যে বিষয়ের স্বরূপ সম্পর্কিত জ্ঞান কার্যকর থাকে না। কেবল অপরের কথায় আস্থা স্থাপন করে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রবক্তা হওয়া যায়। এ উপায়কে বলা হয় "তাকলীদ"। অর্থাৎ, অনুসরণ। দ্বিতীয়ত, প্রথমে একথা জানা যে, স্থায়ী ও চিরন্তন বস্তু অবলম্বন করা উত্তম। এরপর জানা যে, আখেরাত চিরন্তন। এ দু'টি মারেফত তথা জানার সাহায্যে একটি তৃতীয় মারেফত অর্জন করা। অর্থাৎ, আখেরাত অবলম্বন করা উত্তম। বলা বাহুল্য, এই তৃতীয় বিষয়টি জানা প্রথমোক্ত দু'টি বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং তৃতীয় মারেফত পর্যন্ত পৌঁছার জন্যে অন্তরে প্রথমোক্ত দু'টি মারেফত উৎপন্ন করাকে বলা হয় ফিকর, তাফাক্কুর, তাদাব্বুর ও তায়াম্মুল। এসব শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সমার্থবোধক।

চিন্তাভাবনার উপকারিতা হচ্ছে জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া এবং যে মারেফত অর্জিত ছিল না, তা অর্জিত হওয়া। অন্তরে যখন মারেফতসমূহ এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংগ্রহীত হয়, তখন সেগুলো থেকে আরও মারেফত নির্গত হয়।

অর্থাৎ, নতুন মারেফতটি প্রথম মারেফতের ফল। যখন এই নতুন মারেফতটি অন্য মারেফতের সাথে যোগ হয়, তখন এ থেকে আরও একটি ফল অর্জিত হয়। এমনিভাবে ফল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জ্ঞানও বাড়তে থাকে। মারেফতের এই প্রবৃদ্ধি মৃত্যু অথবা অন্য কোন বাধার কারণেই শুধু বন্ধ হতে পারে।

এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সে ব্যক্তিই অর্জন করতে পারে, যে জ্ঞানের মাধ্যমে ফললাভ করতে সক্ষম এবং চিন্তাভাবনার পন্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। কিন্তু অধিকাংশ লোক জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত। কারণ, তাদের কাছে পুঁজিই নেই। অর্থাৎ, সে মারেফত নেই, যা দ্বারা অন্য মারেফত সৃষ্টি হয়, যেমন কারও কাছে মূলধন না থাকলে সে মুনাফা অর্জন করতে পারে না। মাঝে মাঝে মূলধন থাকে, কিন্তু ব্যবসায়ের নিয়ম-কানুন জানা না থাকার কারণে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয় না। অনুরূপভাবে কখনও মানুষের কাছে মারেফত থাকে, কিন্তু সেগুলো এমনভাবে ব্যবহার করতে পারে না, যাতে ফল লাভ হয়। ব্যবহার পদ্ধতির জ্ঞান কখনও অন্তরে খোদায়ী নূরের কারণে জন্মগতভাবে অর্জিত হয়, যেমন, পয়গম্বরগণের ছিল। এটা খুবই বিরল। কখনও শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে এ জ্ঞান অর্জিত হয়। এটাই মানুষের মধ্যে বেশী।

চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে কখনও মারেফত আসে এবং ফলও অর্জিত হয়। কিন্তু অর্জিত হওয়ার অবস্থা সে জানে না এবং বর্ণনা করতে পারে না। বর্ণনা শাস্ত্রে দক্ষতার অভাবই এর কারণ। উদাহরণতঃ অনেক মানুষ জানে আখেরাত অবলম্বন করা উত্তম। কিন্তু তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তারা কখনও বর্ণনা করতে সক্ষম হয় না।

সারকথা, ফিকর হচ্ছে অর্জিত দু'টি মারেফত দ্বারা তৃতীয় মারেফত অর্জন করা। এর ফল জ্ঞান, হাল, আমল ইত্যাদি সবই হতে পারে। কিন্তু এর বিশেষ ফল হচ্ছে জ্ঞান। তবে অন্তরে যখন জ্ঞান অর্জিত হয়, তখন অন্তরের হাল বদলে যায়। বদলে গেলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলও বদলে যায়। কেননা, আমল হালের অনুসারী, হাল জ্ঞানের এবং জ্ঞান ফিকরের অনুগামী। এ থেকে জানা গেল যে, ফিকর যাবতীয় নেক আমলের মূল ও উৎস। এ থেকে ফিকরের ফযীলতও প্রমাণিত হয়। আরও প্রমাণিত হয় যে, ফিকর যিকরের তুনলায় উত্তম। কেননা, ফিকরের মধ্যে যিকর তো থাকেই, আরও কিছু বিষয় অতিরিক্ত থাকে। যিকর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের

তুলনায় উত্তম; বরং আমলের উৎকর্ষ এ কারণেই সাধিত হয় যে, এতে কিছু যিকরও থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, ফিকর যাবতীয় এবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ কারণেই বলা হয়েছে, এক মুহূর্তের ফিকর এক বছরের এবাদত অপেক্ষা উত্তম।

মোটকথা, এখানে পাঁচটি স্তর রয়েছে। এক, তাযাক্কুর অর্থাৎ, অন্তরের দু'টি মারেফত অর্জন। দুই, তাফাক্কুর অর্থাৎ, অর্জিত দুই মারেফতের সাহায্যে তৃতীয় উদ্দিষ্ট মারেফত তলব। তিন, প্রার্থিত মারেফত অর্জিত হওয়া এবং তা দ্বারা অন্তর আলোকিত হওয়া। চার, মারেফতের নূর অর্জিত হওয়ার কারণে অন্তরের হাল বদলে যাওয়া। পাঁচ, অন্তরের হাল বদলে যাওয়ার মত বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল বদলে যাওয়া এবং অন্তরের খেদমত করা। পাথর দ্বারা লোহাকে আঘাত করলে আগুন নির্গত হয়। তা দ্বারা স্থান আলোকোজ্জ্বল হয়। চোখে দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমল করতে উদ্যত হয়। ঠিক এমনিভাবে মারেফতের নূর থেকে ফিকর জন্মলাভ করে। এই ফিকর উভয় মারেফতকে সমন্বিত করে বিশেষভাবে সাজায়, যার ফলে মারেফতের নূর ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর এই নূরের মাধ্যমে অন্তর বদলে যায় এবং পূর্বে যে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট ছিল না তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। যেমন, আগুনের আলোকে চোখের অবস্থা বদলে যায় এবং পূর্বে যা দৃষ্টিগোচর হত না, তা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। অতঃপর অন্তরের অবস্থার দাবী অনুযায়ী আমলের জন্যে অঙ্গ গতিশীল হয়। যেমন, অন্ধকারের কারণে যে ব্যক্তি কাজ করতে পারত না, আলো আসার পর সে কাজে তৎপর হয়। সুতরাং জানা গেল ফিকরেরই ফল হচ্ছে জ্ঞান ও হাল। এই জ্ঞান ও হাল অসংখ্য ও অগণিত।

ফিকরের পথ ঃ ফিকর কখনও ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদিতে এবং কখনও ধর্ম সম্পর্কিত নয়— এমন বিষয়াদিতে হয়ে থাকে। এখানে ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ফিকর বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয় বলে আমাদের উদ্দেশ্য এমন বিষয়, যা আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে পাওয়া যায়। এখন ফিকর বান্দা, তার গুণাবলী ও হাল সম্পর্কিত বিষয়ে হবে, অথবা আল্লাহ তা'আলা, তাঁর গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে হবে। বান্দা সম্পর্কিত বিষয়ের ফিকর দু' রকম। এক– বান্দার এমন হাল নিয়ে ফিকর, যা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় এবং দুই– বান্দার এমন হাল নিয়ে ফিকর, যা আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয়। এ দু'টি প্রকার ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে ফিকর করার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত ফিকরও দুই প্রকার। এক— আল্লাহ তা'আলার সত্তা, গুণাবলী ও সুন্দর নামসমূহ (আসমায়ে হুসনা) নিয়ে ফিকর এবং দুই— তাঁর ক্রিয়াকর্ম, সাম্রাজ্য, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু নিয়ে ফিকর। নিম্নে আমরা ফিকরের উপরোক্ত চারটি প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

(১) বান্দার গুণাবলী ও কর্ম সম্পর্কে ফিকর করার উদ্দেশ্য একথা জানা যে, বান্দার কোন্ কোন্ গুণ ও কর্ম আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন এবং কোন্গুলি অপছন্দ করেন। এই গুণ ও কর্ম আবার দু'প্রকার— বাহ্যিক; যেমন, এবাদত ও গোনাহ এবং অভ্যন্তরীণ; যেমন, উদ্ধারকারী ও ধ্বংসকারী গুণাবলী। দ্বিতীয় প্রকারের পাত্র হচ্ছে বান্দার অন্তর। পূর্বেকার খণ্ডগুলোতে এসব গুণা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

এখানে আমরা গোনাহ, এবাদত, ধ্বংসকারী গুণ ও উদ্ধারকারী গুণ— এই প্রকার চতুষ্টয়ের জন্যে এক একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব— যাতে চিন্তাভাবনার পথ খুলে যায় ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং এর সাহায্যে আরও দৃষ্টান্ত বুঝে নেয়া যায়।

প্রথমত, গোনাহ সম্পর্কে মানুষের উচিত, প্রতিদিন ভোর বেলায় চিন্তা করা যে, সে কোন গোনাহ করছে কিনা? যদি উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন গোনাহে লিপ্ত থাকে, তবে তা বর্জন করবে। অতীতে করে থাকলে তওবা ও অনুশোচনার মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ করে নেবে। আর যদি সেদিন করবে এমন গোনাহ থাকে, তবে তা থেকে বিরত থাকার প্রস্তুতি নেবে। উদাহরণতঃ নিজের জিহ্বা সম্পর্কে চিন্তা করবে, এর মাধ্যমে গীবত, মিথ্যা, আত্মপ্রশংসা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অনর্থক কথাবার্তা ইত্যাদি গোনাহ হয়ে থাকে। অতএব, এসব গোনাহের কোন একটিতে কার্যত লিপ্ত থাকলে তা বর্জন করবে এবং অন্তরে একথা বদ্ধমূল করে নেবে যে, এসব বিষয় আল্লাহ তা'আলার কাছে গর্হিত। কোরআন ও হাদীসে এগুলোর শাস্তি বর্ণিত রয়েছে। এরপর চিন্তা করবে যে, এগুলো থেকে কিরূপে আত্মরক্ষা করা যায়। এ প্রসঙ্গে জানা দরকার যে, একান্তবাস ও একাকীত্ব অবলম্বন করা ছাড়া জিহ্বার গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। এর আরেকটি উপায় কোন সৎ ও পরহেযগার ব্যক্তির সংসর্গে থাকা, যাতে সে কোন অন্যায় কথা মুখ থেকে বের হলেই বাধা প্রদান করতে পারে। অথবা মানুষের কাছে বসার সময় মুখে কংকর রেখে দেয়া যায়, যাতে তা সংযমের কথা সর্বক্ষণ স্মরণ করিয়ে দেয়।

অনুরূপভাবে কান সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, এরই মাধ্যমে গীবত, মিথ্যা, বাজে কথা, ক্রীড়াকৌতুক ও বেদআতী কথাবার্তা শ্রবণ করা হয়। এটা খারাপ কথা। অতএব, এসব বিষয় শ্রবণ করা থেকে বেঁচে থাকার উপায় হচ্ছে একান্তে বাস করা। অথবা সামনে কেউ এসব কথা বললে তাকে নিষেধ করা। উদর সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, উদর পানাহারে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে। হালাল রিযিক মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে খাহেশ বৃদ্ধি করে, যা শয়তানের হাতিয়ার, অথবা হারাম ও সন্দেহজনক খাদ্য ভক্ষণ করে। অতএব দেখবে, তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও জীবিকা কিভাবে আসে। তৎসঙ্গে হালাল রিযিকের উপায় চিন্তা করবে। এটা জেনে নেবে যে, হারাম খাদ্য খেয়ে যত এবাদতই করা হোক না কেন, সবই পণ্ডশ্রম। হালাল রিযিক এবাদতের মূল। আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির নামায কবুল করেন না, যার পরিধেয় বস্ত্রে হারামের এক দেরহামও ব্যয়িত হয়েছে। এমনিভাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবে।

দ্বিতীয়ত, এবাদতের মধ্যে প্রথমে ফরয এবাদত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবে যে, একে দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখা হয় কিনা এবং এর ত্রুটি নফল এবাদত দ্বারা পূরণ করা হয় কিনা? অতঃপর প্রত্যেক অঙ্গের এবাদত সম্পর্কে চিন্তা করবে, যে অঙ্গের যে এবাদত আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয়, তা সেই অঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে কিনা? উদাহরণতঃ চক্ষু দেখার জন্য সৃজিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এবাদতে মশগুল থাকার জন্যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রহস্যসমূহ শিক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আল্লাহর কিতাব ও হাদীস দেখতে হবে। এগুলো দেখে চক্ষুকে এবাদতে মশগুল করতে মানুষ সক্ষম। অতএব, চিন্তা করবে চক্ষু দ্বারা এসব করা হয় না কেন?

এমনিভাবে কান সম্পর্কে চিন্তা করে বলবে— আমি মযলুমের ফরিয়াদ শুনতে পারি, জ্ঞানের কথাবার্তা, কেরাআত এবং যিকর শুনতে পারি। তবে কেন কানকে বেকার রাখি? জিহ্বা সম্পর্কে চিন্তা করবে, আমি জিহ্বা দ্বারা শিক্ষাদান ও ওয়ায করে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে পারি। সাধু পুরুষদের অন্তরে আসন করতে পারি। ভাল ভাল কথা বলতে পারি, যার প্রত্যেকটি বাক্যই হবে সদকা। এ নেয়ামত থেকে আমি আমার জিহ্বাকে কেন বঞ্চিত রাখি? ধন-সম্পদ সম্পর্কে চিন্তা করবে, আমি অমুক ধন সদকা করতে পারি। কারণ, এর প্রয়োজন আমার নেই। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে,

আল্লাহ তা'আলা দান করবেন। অতএব, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দেহ, ধন-সম্পদ, গবাদি পশু ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, এসব বস্তু মানুষের জন্যে হাতিয়ার ও উপায়-উপকরণ, যা দ্বারা সে আল্লাহ তা'আলার এবাদত করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

তৃতীয়ত, চিন্তাভাবনার বিষয় বিনাশকারী গুণাবলী, সেগুলোর স্থান অন্তর। এগুলো হচ্ছে খাহেশের প্রাবল্য, ক্রোধ, কৃপণতা, অহংকার, আত্মপ্রীতি, রিয়া, হিংসা, কুধারণা, ঔদাসীন্য, গর্ব ইত্যাদি। যদি মনে করা হয় যে, অন্তর এসব মন্দ স্বভাব থেকে পাক ও পবিত্র, তবে এর পরীক্ষা নেবে। কেননা, নফস সর্বদাই সৎকর্মের ওয়াদা করতে থাকে এবং বাস্তবক্ষেত্রে তার বিপরীত কাজ করে। পরীক্ষা এই যে, উদাহরণতঃ নফস যদি অহংকার থেকে মুক্ত হওয়ার দাবী করে, তবে একটি লাকড়ীর বোঝা মাথায় চেপে বাজারে চলে যাবে, যাতে দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এমনিভাবে নফসের পরীক্ষা নিতেন। আর যদি নফস জ্ঞান-গরিমার দাবী করে, তবে এমন কোন কাজ করবে, যা অন্যের উপর ক্রোধের সঞ্চার করে, এরপর দেখবে সে ক্রোধ সংবরণ করতে পারে কিনা? এমনিভাবে সকল গুণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা হওয়া উচিত যে, এসব গুণ তার মধ্যে আছে কিনা? যদি কোন লক্ষণ দ্বারা জানা যায় যে, অমুক গুণ তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তবে এমন উপায় চিন্তা করবে, যাতে সে গুণটি তার দৃষ্টিতে মন্দ প্রতিভাত হয় এবং তার কারণ যে মূর্খতা, তা ফুটে উঠে। উদাহরণতঃ যদি নিজের মধ্যে অহংকার গুণটি পায়; তবে নফসকে এভাবে বুঝাবে যে, তুই নিজেকে কেন বড় মনে করিস? বড় তো সেই, যে আল্লাহ তা'আলার কাছে বড়। মৃত্যুর পরই জানা যাবে তাঁর কাছে কে বড়! বাহ্যত এমনও হয় যে, এক জন কাফের আজীবন কুফর করে মৃত্যুর সময় আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল বান্দা হয়ে মরতে পারে এবং একজন মুমিন অন্তিম মুহূর্তে ঈমান থেকে খারিজ হয়ে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে। অহংকারের এ বিপর্যয় জানার পর এটা দূর করার প্রতিকার চিন্তা করবে। বলা বাহুল্য, এর প্রতিকার হচ্ছে বিনম্র লোকদের অনুরূপ কাজকর্ম অবলম্বন করা।

চতুর্থত, উদ্ধারকারী গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা। এগুলো হচ্ছে তওবা ও গোনাহের জন্যে অনুশোচনা, বিপদে সবর, নেয়ামতে শোকর, ভয়, আশা, সংসার-বিমুখতা, এখলাস, সত্যবাদিতা, আল্লাহর মহব্বত, আল্লাহর

তাযীম, আল্লাহর কাজে সন্তুষ্টি, নম্রতা, বিনয় ইত্যাদি। অতএব, বান্দার প্রত্যহ চিন্তাভাবনা করা উচিত যে, এগুলোর মধ্য থেকে তার কোন্ গুণটির প্রয়োজন। এরপর উদাহরণতঃ যদি তওবা ও অনুশোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়, তবে প্রথমে নিজের গোনাহসমূহ অনুসন্ধান করবে। নফসের কাছে সবগুলোকে একত্রিত করবে। অতঃপর শরীয়তে বর্ণিত এসব গোনাহের শাস্তির কথা ভাববে। এরপর মনে মনে বলবে— আমি আল্লাহ তা'আলার গযবের কাজ করছি। এই উপায়ে বান্দার মধ্যে তওবা ও অনুশোচনার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হবে। যদি শোকরের অবস্থা সৃষ্টি করা লক্ষ্য হয়, তবে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহরাজি ও নেয়ামতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করবে। একথাও ভেবে দেখবে যে, তিনি নিজ কৃপায় কেমন পর্দা ফেলে রেখেছেন। গোনাহের কারণে বান্দাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করেননি। ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইলে প্রথমে নিজের যাহেরী ও বাতেনী গোনাহসমূহের প্রতি তাকাবে। এরপর মৃত্যু ও তার যন্ত্রণা, মৃত্যুর পর মুনকির-নকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সওয়াল, কবরের আযাব, সাপ, বিচ্ছু ও কীট-পতঙ্গের দংশন, হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা, চুলচেরা হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাতের তীক্ষ্নতা ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা করবে। অতঃপর দোযখ সম্পর্কে কালামে মজীদে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, সবগুলোকে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত রাখবে। এভাবে বান্দার মধ্যে ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে। রিজা তথা আশার অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইলে জান্নাত, তার আনন্দ, বাগ-বাগিচা, ঝরনা, হুর, গেলমান ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা করবে।

আমরা এ সমস্ত গুণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাতেও চিন্তাভাবনার সম্প্রসারণে সাহায্য হতে পারে। যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা এক জায়গায় পাওয়ার জন্যে কোরআন মজীদ তেলাওয়াতের সমান উপকারী কোন কিছুই নেই। কেননা, কোরআন মজীদে সকল মকাম ও হালের কথা সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে এমন বিষয়ও রয়েছে, যা দ্বারা ভয়, আশা, সবর, শোকর, মহব্বত ও অন্যান্য হাল সৃষ্টি হয়। এগুলোই মানুষকে সকল নিন্দনীয় স্বভাব থেকে বিরত রাখে। অতএব, কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করা দরকার এবং যে বিষয়ে চিন্তাভাবনা উদ্দেশ্য হবে, সে বিষয়ের আয়াত বারবার পাঠ করা উচিত। প্রয়োজন হলে একশ' বার পাঠ করা কর্তব্য। চিন্তাভাবনা ও বোধগম্যতা সহকারে একটি কোরআনী আয়াত পাঠ করা না বুঝে তা

খতম করার চেয়ে অনেক উত্তম। অতএব, আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করার জন্যে বিরতি দেবে, যদিও তাতে এক রাত অতিবাহিত হয়ে যায়। কেননা, কোরআন পাকের এক এক শব্দের অধীনে অগণিত রহস্য নিহিত রয়েছে। পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে চিন্তাভাবনা না করা পর্যন্ত এগুলো হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসসমূহ গভীর চিন্তা সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে। তাঁর উক্তির প্রতিটি শব্দও প্রজ্ঞার এক অকূল দরিয়া। এসব শব্দ সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তি যথাযথ চিন্তা করলে সারা জীবনেও তার চিন্তা পূর্ণ হবে না।

উপরে যা কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা হচ্ছে অন্তর প্রদেশ আবাদ করার চিন্তাভাবনা, যাতে নৈকট্য ও মিলনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং কেউ যদি নফসের সংশোধনেই সমগ্র জীবন ব্যয় করে দেয়, তবে নৈকট্যের স্বাদ কখন আস্বাদন করবে? হযরত খাওয়াস (রহঃ) বিজন বনে ও প্রান্তরে ঘুরাফেরা করতেন। একবার হোসায়ন ইবনে মনসুর (রহঃ) তাঁর সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি অবস্থায় আছেন? তিনি বললেন ঃ তায়াক্কুলে নিজের অবস্থা দুরস্ত করার জন্যে বনে-জঙ্গলে ঘুরাফেরা করছি। হযরত হোসায়ন বললেন ঃ আপনি তো অন্তর প্রদেশ আবাদ করার কাজেই জীবন অতিবাহিত করে দিলেন। তাওহীদে বিলয় কখন অর্জিত হবে? এ থেকে জানা গেল যে, এক আল্লাহয় বিলীন হওয়া সাধকের পরম ও চরম কাম্য ও আনন্দ।

উদ্ধারকারী ও বিনাশকারী গুণসমূহ জেনে নেয়ার পর এগুলোকে সকাল-সন্ধ্যার অভ্যাসে পরিণত করে নেবে এবং এগুলো থেকে মোটেই গাফেল থাকবে না। এ ব্যাপারে সাধক নিজের কাছে একটি নোট বই রাখবে। এতে সকল উদ্ধারকারী ও বিনাশকারী গুণসমূহ এবং যাবতীয় গোনাহ ও আনুগত্যের কাজগুলো লিখে রাখবে। এর পর প্রত্যহ নিজের সাথে সেগুলো মিলিয়ে দেখবে কি কি গুণ তার মধ্যে আছে এবং কি কি নেই। বিনাশকারী গুণসমূহের মধ্য থেকে দশটি বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা যথেষ্ট। এগুলো থেকে বেঁচে থাকলে অন্য সবগুলো থেকে বেঁচে থাকা হয়ে যাবে। দশটি বিষয় এই ঃ (১) কৃপণতা, (২) অহংকার, (৩) আত্মপ্রীতি, (৪) রিয়া, (৫) হিংসা, (৬) কঠোরতা, (৭) খাদ্য-লালসা, (৮) অতিরিক্ত কামভাব, (৯) অর্থলোভ ও (১০) জাঁকজমকপ্রীতি। উদ্ধারকারী গুণসমূহের মধ্যেও দশটিই যথেষ্ট। আর সেগুলো এই ঃ (১) গোনাহের কারণে

অনুতাপ, (২) বিপদে সবর, (৩) আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি, (৪) নেয়ামতের শোকর, (৫) ভয় ও আশার সমতা, (৬) সংসার অনাসক্তি, (৭) আমলে এখলাস, (৮) মানুষের সাথে সদাচরণ, (৯) আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও (১০) আল্লাহর সামনে খুশু ও নম্রতা।

এই বিশটি বিষয়ের মধ্য থেকে, এক একটি বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করবে। উদাহরণতঃ যখন একটি বিনাশকারী অভ্যাস দূর হয়ে যাবে, তখন নোট-বই থেকে সেটি কেটে দেবে এবং সে সম্পর্কে আর চিন্তাভাবনা করবে না। তৎসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার শোকর করবে যে, তিনি একটি থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এমনিভাবে দশটি মন্দ স্বভাব সম্পূর্ণরূপে দূর না হওয়া পর্যন্ত, এক একটি করে নেবে এবং চিন্তাভাবনা করবে। অতঃপর নোট-বই থেকে তা কেটে দিতে থাকবে। এরপর নফসকে উদ্ধারকারী গুণে গুণান্বিত করার প্রয়াস চালাবে। যখন নফস একটি গুণে গুণান্বিত হয়ে যাবে, উদাহরণতঃ তওবা ও অনুতাপের গুণ অর্জিত হয়ে যাবে, তখন নোট-বই থেকে সেটি কেটে দিয়ে অবশিষ্ট গুণসমূহ অর্জনে প্রয়াসী হবে। কিন্তু এই পন্থা অত্যন্ত কর্মতৎপর ব্যক্তির জন্যেই উপকারী। আর যারা সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যে গণ্য, তাদের অধিকাংশের উচিত নোট বইয়ে বাহ্যিক গোনাহও লিখে নেয়া। যেমন, সন্দেহযুক্ত খাদ্য খাওয়া, গীবত করা, ঝগড়া করা, আত্মপ্রশংসা করা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ বর্জন করা ইত্যাদি। কেননা, অধিকাংশ সৎকর্মপরায়ণ বলে গণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে এসব গোনাহ কিছু না কিছু পাওয়া যায়। বাহ্যিক অঙ্গ গোনাহমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর আবাদ করার কাজে মশগুল হওয়া সম্ভব নয়। বরং প্রত্যেক স্তরের মানুষের উপর এক ধরনের গোনাহ প্রবল থাকে। অতএব, সে স্তরের মানুষের উচিত সে ধরনের গোনাহ দূরীকরণে সচেষ্ট হওয়া এবং তারা যে সকল গোনাহের প্রান্তে অবস্থান করে, সেগুলোর জন্যে চিন্তাভাবনা না করা। উদাহরণতঃ পরহেযগার আলেম প্রায়ই নিজের ইলম যাহির করার প্রয়াস পায় এবং মানুষের মধ্যে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি কামনা করে— শিক্ষকতার মাধ্যমে হোক অথবা ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, তারা এমন একটি ফেতনায় পতিত হয়, যা থেকে সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ নাজাত পায় না। অর্থাৎ, এ ধরনের আলেমের কথাবার্তা যদি জনপ্রিয়তা লাভ করে, তবে সে আলেম আত্মপ্রীতি, অহংকার ও লৌকিকতা থেকে মুক্ত থাকে না। কেউ তার কথা অমান্য করলে সে মনে মনে ভীষণ ব্যথা অনুভব

করে; অথচ এই অমান্যকারী ব্যক্তি অন্য কোন আলেমের কথা অমান্য করলে তাতে সে ক্ষুব্ধ হয় না। কেবল নিজের কথা অমান্য করলেই ক্রোধের সঞ্চার হয়। শয়তানের প্ররোচনাই এর কারণ।

মোটকথা, আলেমের ফেতনা অনেক বড়। সে হয় বাদশাহ, না হয় বরবাদ। অতএব, যে আলেম নিজের মধ্যে উপরোক্ত মন্দ স্বভাব অনুভব করবে, তার জন্যে নির্জনবাস, একাকীত্ব, অজ্ঞাত জীবন যাপন ও ফতোয়া দেয়া থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। সাহাবায়ে কেরামের যমানায় অনেক সাহাবী মসজিদে থাকতেন। তারা সবাই আলেম ও মুফতীর ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু ফতোয়া দেয়া থেকে তারা গা বাঁচিয়ে চলতেন। কেউ ফতোয়া দিলেও এটা চাইতেন, অন্য কেউ ফতোয়া দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিক।

নির্জনবাসের সময়ও শয়তানকে ভয় করা উচিত। কারণ, তখন শয়তান এসে বলে— তুমি নির্জনবাস অবলম্বন করো না। কেননা, যদি সবাই এমন করে, তবে মানুষের মধ্য থেকে ইলম বিদায় নেবে। এর জওয়াবে বলা উচিত— ইসলামে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার পূর্বেও ইসলাম পরিপূর্ণ ছিল এবং পরেও থাকবে। আমার মৃত্যুতে দ্বীনের কোন স্তম্ভ ভূমিসাৎ হয়ে যাবে না। কিন্তু আমার অবস্থা এই যে, আমি আমার অন্তরের সংশোধন থেকে বেপরওয়া নই। আমি বসে থাকলে ইলম বিদায় নেবে— একথা নিছক খামখেয়ালী এবং মূর্খতার পরিচায়ক। কেননা, যদি সমস্ত মানুষকে জেলখানায় পুরে বেড়ী পরিয়ে দেয়া হয় এবং ইলম অন্বেষণ করলে আগুনে পুড়িয়ে মারার হুমকি প্রদর্শন করা হয়, তবু বড়ত্ব ও জাঁকজমকের মহব্বত তাদেরকে বেড়ী ছিন্ন করে, জেলের প্রাচীর ভেঙ্গে বাইরে চলে আসতে বাধ্য করবে এবং ইলমের অন্বেষণে নিয়োজিত করবে। অতএব, শয়তান যতদিন মানুষের মনে জাঁকজমক ও নেতৃত্বের মহব্বত জাগ্রত রাখবে, ততদিন ইলম বিদায় নিতে পারবে না। বলা বাহুল্য, শয়তান কিয়ামত পর্যন্ত নিজের কারসাজিতে শৈথিল্য করবে না। ফলে, কিয়ামত পর্যন্ত ইলমও অবশিষ্ট থাকবে। বরং দ্বীনের ইলম এমন লোকদের দ্বারা প্রসার লাভ করবে, যাদের আখেরাতে কোন অংশ নেই। সেমতে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

ان الله يويد هذا الدين باقوام لاخلاق لهم وان الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر -

অর্থাৎ, আল্লাহ এমন লোকদের দ্বারা এই দ্বীনকে শক্তি যোগাবেন, যাদের পরকালে কোন অংশ নেই। আল্লাহ তা'আলা পাপাসক্ত ব্যক্তি দ্বারা এই দ্বীনকে দৃঢ়তা দান করবেন।

সুতরাং শয়তানের এ ধরনের প্ররোচনার ফাঁদে পড়ে মানুষের সাথে মেলামেশায় মশগুল হওয়া এবং পার্থিব জাঁকজমক, প্রশংসা ও সম্মানের মহব্বতকে লালন করা আলেমের জন্যে মঙ্গলজনক নয়। হাদীসে আছে— জাঁকজমক ও ধন-সম্পদের মহব্বত কপটতা উৎপন্ন করে, যেমন পানি শাক উৎপন্ন করে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

ماذئبان ضاربان ارسلافی زربة غنم باكثر فسادا فيها من حب الجاه والمال فی دين المرء المسلم -

অর্থাৎ, দু'টি রক্তপিপাসু বাঘকে ছাগপালে ছেড়ে দিলে তারা এত বেশী ক্ষতি করতে পারে না, জাঁকজমক ও ধনের মহব্বত মুসলমানের দ্বীনের যত বেশী ক্ষতি করে।

জাঁকজমকের মহব্বত নির্জনবাস ও একাকীত্ব অবলম্বন করা ছাড়া অন্তর থেকে উৎপাটিত হয় না। সুতরাং আলেমের উচিত অন্তর থেকে এধরনের গোপন মহব্বতকে খুঁজে বের করা এবং তা দূরীকরণের চিন্তা করা। মুত্তাকী আলেমের জন্যে হল এই চিন্তা-ভাবনা। আর আমাদের মত লোকদের তো সেসব বিষয়ে চিন্তা করা উচিত, যা দ্বারা আমাদের ঈমান কিয়ামতের দিন শক্তিশালী হয়। কেননা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ আমাদেরকে দেখলে নিশ্চিতরূপেই বলবেন এরা কিয়ামতে বিশ্বাস করে না। কারণ, যারা জান্নাত ও দোযখে বিশ্বাস করে, আমাদের আমল তাদের আমলের মত নয়। যে ব্যক্তি যে বস্তুকে ভয় করে, সে সেই বস্তু থেকে পলায়ন করে এবং যে ব্যক্তি যে বস্তুর আকাংখা করে, সে সেই বস্তু অন্বেষণ করে। আমরা আরও জানি, দোযখ থেকে পলায়ন হারাম কর্ম ও গোনাহ বর্জনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অথচ আমরা এগুলোতে আকণ্ঠ ডুবে থাকি। আমাদের আরও জানা আছে যে, জান্নাতের অন্বেষণ অধিক পরিমাণে নফল এবাদতের মাধ্যমে হয়। আমরা এতেও ত্রুটি করি; বরং আমাদের ফরয এবাদতও ঠিকমত আদায় হয় না। সুতরাং আমরা আমাদের ইলমের ফল এই

পেয়েছি যে, দুনিয়ালোভী হওয়ার ব্যাপারে সাধারণ মানুষ আমাদের অনুসরণ করবে এবং বলবে, যদি দুনিয়ার লোভ খারাপ হত, তবে আলেমগণ আমাদের তুলনায় এ থেকে অধিক বেঁচে থাকত। আমরা এখন ভাবছি, আমরা (আলেমরা) যে ফেতনার সম্মুখীন, তা খুবই গুরুতর। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের অবস্থা সংশোধন করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে আমাদেরকে তওবার তাওফীক দেন। তিনি করুণাময় ও নেয়ামতদাতা।

প্রথম প্রকার অর্থাৎ বান্দা তার গুণাবলী ও হাল সম্পর্কে চিন্তাভাবনার আলোচনা এতটুকুই যথেষ্ট। এতেই চিন্তাভাবনার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়। এক্ষণে আমরা দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা, তাঁর গুণাবলী ও কাজকর্ম সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব। এক্ষেত্রে চিন্তাভাবনার সর্বোচ্চ স্তর হল আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করা। কিন্তু এধরনের চিন্তা নিষিদ্ধ। কেননা, শরীয়তে বলা হয়েছে— আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে ফিকর কর— তাঁর সত্তা সম্পর্কে নয়। এর কারণ, তাঁর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করলে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি হতবাক হয়ে যায় এবং কোন কূল-কিনারা পায় না। সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ এদিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারে না। তারাও সর্বক্ষণ তাঁকে দেখার সাধ্য রাখে না। সাধারণ মানুষ যেমন সূর্যের দিকে দেখতে পারে, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়; বেশীক্ষণ দেখলে দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলার সত্তার দিকে দেখা হতবুদ্ধিতার কারণ। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার পথ বর্ণনা না করাই সমীচীন। অধিকাংশ মানুষ এটা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না। কোন কোন আলেম অবশ্য এ বিষয়ে স্বল্প পরিমাণে বর্ণনা করেছেন। যেমন, তারা বলেছেন— আল্লাহ তা'আলা স্থান, পার্শ্ব ও দিক থেকে পবিত্র। তিনি না জগতের অভ্যন্তরে, না বাইরে। তিনি জগতের সাথে মিলিতও নন, পৃথকও নন। এই অল্প-বিস্তর বর্ণনা থেকেই কিছু মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এমন বিভ্রান্ত হয়েছে যাতে তারা একে অস্বীকারই করে বসেছে। বরং কিছুসংখ্যক লোক তো আরো কম বর্ণনাও বরদাশত করতে পারেনি। তাদের কাছে যখন বলা হল যে, আল্লাহ তাআলা মাথা, হাত, পা, চক্ষু ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে মুক্ত, তখন তারা তা মেনে নিল না এবং ধারণা করল যে, এই সংজ্ঞা আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও প্রতাপে ত্রুটির কারণ। তাদের মতে মাহাত্ম্য

ও প্রতাপ এ সকল অঙ্গের মধ্যে সীমিত। কেননা, মানুষ কেবল নিজেকেই জানে ও চিনে। কাজেই যে, বস্তু গুণে মানুষের সমান নয়, কোন মাহাত্ম্যও সে বুঝে না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা জনৈক পয়গম্বরের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠান যে, আমার বান্দাদের কাছে আমার গুণাবলী বর্ণনা করো না। করলে তারা আমাকে মানবে না। বরং আমার অবস্থা এমন ভাষায় বর্ণনা কর, যা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও সিফাত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা নিষিদ্ধ বিধায় আমরা এ বিষয়টি ছেড়ে অন্য বিষয়ের প্রতি আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছি। তা হল, সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ক্রিয়াকর্ম ও সিফাতের রহস্যাবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা। কেননা, এসবের মধ্যে তাঁর প্রতাপ, মাহাত্ম্য, পবিত্রতা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পূর্ণতা পাওয়া যায়। অতএব সিফাত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা সিফাতের ফলাফল দ্বারাই করা উচিত। তাঁর সিফাতের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার সাধ্য যখন আমাদের নেই, তখন সিফাতের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি দেয়াই উচিত। যেমন, সূর্য যখন চমকিতে থাকে, তখন আমরা তার দিকে তাকাতে পারি না; বরং ভূপৃষ্ঠের দিকে তাকাতে পারি এবং এর মাধ্যমেই চন্দ্র ও তারকার আলোর তুলনায় সূর্যকিরণের গুরুত্ব বুঝতে পারি। কারণ, ভূপৃষ্ঠের আলোকিত হওয়া সূর্যকিরণেরই ফল। দুনিয়াতে যা কিছু বিদ্যমান সমস্তই খোদায়ী কুদরতের ফল এবং আল্লাহর সত্তার নূরসমূহের একটি নূর।

সূর্যগ্রহণের সময় আমরা পাত্রে পানি রেখে তাতে সূর্যগ্রহণের দৃশ্য অবলোকন করি, যাতে আমাদের দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি না হয়। সুতরাং সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা অর্জনের জন্যে পানি একটি উপায়। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজকর্মও তাঁর গুণাবলী প্রত্যক্ষ করার উপায়। এই উপায়ে গুণাবলী প্রত্যক্ষ করলে জ্ঞান-বুদ্ধির হতবাক হওয়ার আশংকা থাকে না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

تفكروا فى خلق الله ولاتتفكروا فى ذات الله -

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর এবং তাঁর সত্তা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো না।

সুতরাং এখন সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনার নিয়ম-পদ্ধতি জানা দরকার।

প্রকাশ থাকে যে, বিশ্ব-জাহানে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যা কিছু বিদ্যমান, তা তাঁরই কর্ম ও তাঁরই সৃষ্টি। এর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে অসংখ্য বৈচিত্র্য ও রহস্য রয়েছে, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞা, শক্তিমত্তা, প্রতাপ ও মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। নিম্নে নমুনাস্বরূপ আমরা কিছু বৈচিত্র্য ও রহস্যের উল্লেখ করছি।

আল্লাহ তা'আলার সৃজিত অনেক বিদ্যমান বস্তু আমাদের জানার বাইরে রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা যায় না। আমাদের অজানা বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন— وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, তিনি এমন বস্তু সৃষ্টি করেন, যা তোমরা জান না। আবার এমনও অনেক বস্তু রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে জানি— বিস্তারিত নয়। এরূপ বস্তুসমূহকে বিস্তারিত ভাবে জানার জন্যে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। এরূপ বস্তুর কতক চোখে দেখা যায় এবং কতক দেখা যায় না। যেগুলো চোখে দেখা যায় না, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আরশ, কুরসী ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনার পরিসর খুবই অল্প। যে সকল বস্তু দেখা যায়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সপ্ত আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ। আকাশে দেখা যায় তারকারাজি, চন্দ্র, সূর্য, তাদের পরিভ্রমণ, উদয়, অস্ত ইত্যাদি। পৃথিবীতে দেখা যায় পর্বতমালা, খনি, খাল, বিল, নদী, প্রাণী ও উদ্ভিদ। আর আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তীতে দেখা যায় মেঘমালা, বৃষ্টি, বরফ, শিলা, বজ্র, বিদ্যুৎ ও ঝড়ঝঞ্ঝা। মোটকথা, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের হাজারো শ্রেণী ও প্রকার রয়েছে। এগুলোর আকার-আকৃতি ও গুণাগুণে যে পরিমাণ বিভিন্নতা দেখা যায়, সে পরিমাণে বিভক্তিও বেড়ে যায়। এগুলোর প্রত্যেকটি প্রকার নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণী, আকাশ ও নক্ষত্রের প্রতিটি কণাকেই আল্লাহ তা'আলা গতিশীল করেন। এসব বস্তু আল্লাহ তা'আলার একত্ব, প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের জ্বলন্ত নিদর্শন। কোরআন মজীদে এসব বস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনে এবং দিবারাত্রির পরিবর্তনে বুদ্ধিজীবীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

এ ধরনের আয়াত কোরআন পাকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বহু জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। কোন কোন আয়াতে চিন্তাভাবনার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণতঃ আল্লাহ তা'আলার এক নিদর্শন এই যে, মানুষ বীর্য থেকে সৃজিত হয়েছে এবং মানুষের সর্বাধিক নিকটবর্তী হচ্ছে তার নফস। এতে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্যের পরিচায়ক এত অধিক বিস্ময়কর বিষয় রয়েছে যে, মানুষ সারা জীবন অধ্যয়ন করেও তার এক-দশমাংশও জানতে পারে না। অথচ সে এগুলো থেকে গাফেল। যে মানুষ নিজের নফস থেকেই গাফেল, সে অন্যের মারেফত লাভ করার আশা কিরূপে করতে পারে? আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে মানুষকে তার নিজের নফস সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে—

وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ -

অর্থাৎ, স্বয়ং তোমাদের মধ্যে কি রয়েছে, তা কি তোমরা দেখ না?

আরও উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ নাপাক বীর্য দ্বারা সৃজিত। এরশাদ হয়েছে—

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ
فَقَدَّرَهٗ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ -

অর্থাৎ, মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ! তিনি কি বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন? বীর্য থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তার বিকাশ সাধন করেছেন। এরপর তার পথ সহজ করেছেন। অতঃপর তার মৃত্যু ঘটিয়েছেন এবং তাকে সমাহিত করেছেন। এরপর যখন ইচ্ছা তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ -

অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি হল এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষরা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ।

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى -

অর্থাৎ, মানুষ কি স্খলিত বীর্য ছিল না? অতঃপর হয়েছে রক্তপিণ্ড। এরপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দিয়েছেন ও সুঠাম করেছেন।

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ -

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর আমি তা স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ -

অর্থাৎ, মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতর্ককারী।

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ

অর্থাৎ, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত বীর্য থেকে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا -

অর্থাৎ, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে। অতঃপর আমি তাকে বীর্যরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। এরপর আমি বীর্যকে পরিণত করি জমাট রক্তে। অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপিঞ্জরে। অতঃপর আমি অস্থিপিঞ্জরকে পরিয়ে দেই মাংস।

অতএব কোরআন মজীদে বারবার বীর্য উল্লেখ করার উদ্দেশ্য বীর্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে বলা। উদাহরণতঃ এভাবে যে, এটি একটি অপবিত্র পানির ফোঁটা, যা কিছুক্ষণ বায়ু লাগা অবস্থায় রেখে দিলে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। রব্বুল আলামীন এই নাপাক বস্তুটিকে নরের মেরুদণ্ড এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে কিরূপে বের করেছেন! নর ও নারীর কিরূপে মিলন ঘটিয়েছেন! নর ও নারীর অন্তরে পারস্পরিক প্রেম ও ভালবাসা স্থাপন করে তাদেরকে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। অতঃপর সহবাসের মাধ্যমে নর থেকে বীর্য বের করে নারীর গর্ভাশয়ে স্থাপন করেছেন। এরপর ঋতুর নাপাক রক্ত কোন কোন শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে টেনে গর্ভাশয়ে একত্রিত করেছেন এবং বীর্য থেকে ভ্রূণ তৈরী করে তাকে ঋতুর রক্ত খাইয়ে খাইয়ে লালন-পালন করেছেন। শুভ্র উজ্জ্বল বীর্যকে তিনি কিরূপে লাল জমাট রক্তে পরিণত করেছেন, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ড বানিয়েছেন। যে বীর্যের সকল অংশ একইরূপ ছিল তাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে এক অংশকে অস্থি, এক অংশকে শিরা-উপশিরা এবং এক অংশকে মাংসে পরিণত করেছেন। এরপর মাংস ও শিরা দ্বারা বাহ্যিক অঙ্গ কিরূপে তৈরী করেছেন। মাথা গোলাকার করেছেন, কান, চক্ষু, নাক ও মুখমণ্ডলকে প্রশস্ত করেছেন এবং হাত-পা-কে লম্বা বানিয়েছেন। এগুলোর মাথায় অঙ্গুলি সংযুক্ত করেছেন। এরপর অভ্যন্তরীণ অঙ্গ অর্থাৎ, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, যকৃত, প্লীহা, ফুসফুস, গর্ভাশয়, মূত্রাশয় ও অন্ত্র কিরূপে তৈরী করেছেন। প্রত্যেকটির আকার, পরিমাণ ও কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

চক্ষুকে সাতটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক স্তরের গুণাগুণ ভিন্ন এবং আকারও ভিন্ন। যদি একটি স্তর বিফল হয়ে যায় অথবা কোন গুণ বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যাবে।

এখন অস্থি সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার যে, নরম ও তরল বীর্য থেকে কেমন শক্ত ও সুঠাম অস্থি নির্মিত হয়েছে! এই অস্থির সাহায্যেই দেহ সোজা থাকে। ছোট-বড়, লম্বা, বেঁটে, গোল ও প্রশস্ত ইত্যাদি অনেক প্রকারের অস্থি নির্মিত হয়েছে। মানুষের প্রয়োজন ছিল সকল অঙ্গ দিয়ে নড়াচড়া করার এবং বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ অঙ্গ নাড়া দেয়ার। তাই অস্থি একটি নয়— অনেক নির্মাণ করে সেগুলোর মধ্যে জোড়া ও গ্রন্থি স্থাপন করা হয়েছে, যাতে নড়াচড়া সহজ হয়।

এরপর মস্তকের গঠন প্রণালী লক্ষ্য করা উচিত। এখানে পঞ্চান্নটি

আলাদা আলাদা আকার-আকৃতির অস্থিকে কিরূপে একত্রিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ছয়টি অস্থি বিশেষভাবে মস্তকের উপরিভাগের, চৌদ্দটি উপরকার চোয়ালের, বারটি নীচের চোয়ালের এবং অবশিষ্টগুলো দাঁত। দাঁতের মধ্যে কতক প্রশস্ত ও চর্বণ ক্ষমতাসম্পন্ন, কতক তীক্ষ্ণ, কর্তন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং কতক চোখা। এরপর গ্রীবাকে মস্তকের বাহন করে তাকে পৃষ্ঠদেশের উপর স্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর নিতম্বের অস্থি পর্যন্ত চব্বিশটি আংটি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। নিতম্বের অস্থি তিনটি। বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে। অতঃপর পিঠের অস্থিসমূহকে বুকের অস্থি, কাঁধ, হাত, নাভির নিম্ন ও নিতম্বের অস্থিসমূহের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এরপর রয়েছে, উরু, পায়ের গোছা ও পায়ের অঙ্গুলিসমূহের অস্থি। সমস্ত দেহে মোট দু'শত আটচল্লিশটি অস্থি রয়েছে। এতে সেসব ক্ষুদ্র অস্থিসমূহ অন্তর্ভুক্ত নয়, যেগুলো দ্বারা গ্রন্থির গর্ত ভরাট করা হয়েছে। এখন লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে এক নরম ও তরল শুক্রবিন্দু থেকে কেমন করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি অস্থির আকার-আকৃতি রেখেছেন। আলাদা আলাদা এবং সংখ্যা রেখেছেন নির্দিষ্ট। তন্মধ্যে একটি বেড়ে গেলে যেমন অসহ্য যন্ত্রণার কারণ হয়ে যায়, তেমনি একটি কম হলেও তা পূরণ করার প্রয়োজন হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে অস্থি সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা করা হয়, তার উদ্দেশ্য থাকে অস্থি চিকিৎসায় দক্ষতা সৃষ্টি করা। আর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করেন। অতএব উভয় চিন্তার মঞ্চে বিরাট তফাত।

মোটকথা, মানুষের সমগ্র দেহ চিন্তাভাবনার বিচরণক্ষেত্র। এরপর যদি মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণাগুণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়, তবে তার ফলশ্রুতিতেও অনেক আশ্চর্য বিষয় ও অনন্য কারিগরী আমাদের সামনে আসে। আল্লাহ পাকের এসব কারিগরী একবিন্দু নাপাক পানিতে নিহিত।

এখন চিন্তা করা দরকার, যিনি এক ফোঁটা পানিতে এতসব শিল্পকর্ম করেন, তিনি সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সৃষ্টিতে না জানি কত কিছু করে থাকবেন! গঠন প্রণালীর দিক দিয়ে সৌরজগত অত্যন্ত দৃঢ়, অটল ও ঘন এবং কারিগরীর দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নিখুঁত। মানবদেহের তুলনায় এতে অধিক অত্যাশ্চর্য বিষয়সমূহের সমাবেশ ঘটেছে। বরং সৌরজগতের আশ্চর্য বিষয়াদির সাথে সমগ্র ভূপৃষ্ঠের আশ্চর্য বিষয়াদির কোন তুলনাই হয় না। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا
وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا -

অর্থাৎ, তোমাদের সৃষ্টি কঠিনতর, না আকাশের? তিনি সেটা নির্মাণ করেছেন। তিনি একে উচ্চ ও বিন্যস্ত করেছেন। তিনি রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনে প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক।

আমরা প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত কোন চিত্রকরের সুনিপুণ হাতে তৈরী সুন্দর ও নিখুঁত চিত্র দেখে চিত্রকরকে বাহবা দেই এবং তার শিল্পকর্মের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি। অন্তরে তাকে একজন মহান শিল্পী বলে বিশ্বাস করতে থাকি। অথচ আমরা জানি, এ চিত্র কেবল রঙ, তুলি, সুনিপুণ হাত, প্রাচীর ও ইচ্ছাশক্তি সমন্বয়ে গঠিত। এগুলোর কোনটিই চিত্রকরের সৃষ্ট নয়; বরং এগুলো আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। চিত্রকর শুধু রঙকে এক বিশেষ ক্রম অনুসারে প্রাচীরগাত্রে সাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এতেই আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। অপরপক্ষে স্বয়ং মানব সৃষ্টি দেখে আমরা কখনও বিস্মিত হই না যে, সৃষ্টিকর্তা এক ফোঁটা নাপাক বীর্যকে কিরূপ পৃষ্ঠদেশে ও বক্ষে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেখান থেকে বের করে তার সুসমঞ্জস আকৃতি তৈরী করেছেন। এর অংশসমূহ একই আকারের ছিল। সেগুলোকে আলাদা আলাদা অঙ্গে পরিণত করেছেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে উন্নতি দান করে সেই শুক্রবিন্দুকে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন, দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, বোধশক্তিসম্পন্ন ও বাকশক্তিসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানবে পরিণত করেছেন।

সৃষ্টিকর্তার এ অনুগ্রহ সত্যিই বিস্ময়কর যে, জন্মগ্রহণের পর শিশু যখন নিজের জন্য কিছুই করতে পারে না, তখন পিতা-মাতা উভয়েই আল্লাহ প্রদত্ত স্নেহের কারণে তার সেবা-যত্ন করে। যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে এ স্নেহ সৃষ্টি না করতেন, তবে শিশুর চেয়ে অধিক অক্ষম এ পৃথিবীতে কেউ হত না। এরপর বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে শক্তি-সামর্থ, জ্ঞান-বুদ্ধি ও হেদায়েত দান করেছেন। এরপর শিশু সবল ও সুঠাম হয়ে কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ হয়ে যায়। তখন সে কৃতজ্ঞ অথবা অকৃতজ্ঞ, আনুগত্যশীল অথবা নাফরমান, ঈমানদার অথবা কাফের হয়। সেমতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا - اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا - اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا -

অর্থাৎ, মানুষের উপর দিয়ে এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন মানবসত্তা উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত বীর্য থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্যে। অতঃপর আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। আমি তাকে পথের দিশা দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ।

উপরে মানবদেহের কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর বিষয় উল্লেখ করা হল। যদিও সবগুলো লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। কেউ চিন্তা করতে চাইলে এতটুকু বিষয় চিন্তা দৌড়ানোর জন্যে পর্যাপ্ত এবং এগুলো স্রষ্টার মাহাত্ম্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু মানুষ এগুলো থেকে গাফেল হয়ে পেট ও পিঠের ধান্দায় সর্বতোভাবে নিয়োজিত রয়েছে। সে এ ছাড়া কিছুই করতে পারে না যে, ক্ষুধা লাগলে খেয়ে নিল এবং যখন উদর তৃপ্ত হয়ে গেল ঘুমিয়ে পড়ল। কাম-বাসনা উত্তেজিত হলে সহবাস করে নিল এবং ক্রোধ হলে লড়ে নিল। অথচ এসব কাজে চতুষ্পদ জন্তু এবং হিংস্র প্রাণীরাও তার সাথে শরীক। যে মানবীয় বৈশিষ্ট্য থেকে চতুষ্পদ জন্তুরা বঞ্চিত, তা হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রহস্য এবং জান ও জাহানের অত্যাশ্চর্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে আল্লাহ তা'আলাকে চেনা ও জানা। কেননা, এর মাধ্যমেই মানুষ নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের দলে প্রবেশাধিকার পায় এবং পয়গম্বর ও সিদ্দীকগণের তালিকাভুক্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকটে চলে যায়। চতুষ্পদ জন্তুরা এ স্তর লাভ করতে পারে না এবং সে মানুষও পারে না, যে দুনিয়াতে কেবল চতুষ্পদ জন্তুদের কামভাব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। তাই এরূপ মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম। কারণ, তাদের মধ্যে মূলতই খোদায়ী মারেফত লাভের ক্ষমতা নেই। মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এ ক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ তাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে।

আত্মচিন্তার পদ্ধতি জানার পর, এখন মানুষের আবাসস্থল পৃথিবী সম্পর্কে চিন্তাভাবনার পালা। পৃথিবীতেও অনেক নিদর্শন বিদ্যমান। আল্লাহ

তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠকে শয্যা করেছেন। এতে পথ ও সড়ক নির্মাণ করে একে চলাফেরার উপযোগী করেছেন। এতে পর্বতমালার পেরেক লাগিয়ে দিয়েছেন, যাতে নড়াচড়া না করে। এরপর একে এত বিস্তীর্ণ করেছেন, যাতে কেউ সারা জীবন পরিভ্রমণ করেও এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছতে পারে না। সেমতে আল্লাহ পাক এসব বিষয় বর্ণনা করে বলেন ঃ

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ -

অর্থাৎ, আমি আকাশ নির্মাণ করেছি, আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহা ক্ষমতাশালী। আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি। আমি কত সুন্দর বিছানাকারী।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا -

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের জন্যে ভূমিকে সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা এর আনাচে-কানাচে বিচরণ কর।

اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا -

অর্থাৎ, যিনি তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন শয্যা।

এমনিভাবে কালামে মজীদে পৃথিবীর উল্লেখ বহু জায়গায় হয়েছে, যাতে এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর উপরিভাগকে জীবন্ত মানুষের বসবাসের জায়গা করেছেন এবং অভ্যন্তর ভাগকে করেছেন মৃতদের নিদ্রাস্থল। তাই এরশাদ হয়েছে—

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا -

অর্থাৎ, আমি কি পৃথিবীকে জীবিত ও মৃতদের জন্যে ধরিত্রীরূপে সৃষ্টি করিনি? যে ভূমিকে নিষ্প্রাণ দেখা যায়, বৃষ্টির পানি বর্ষিত হলে তাই সজীব হয়ে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং রঙ-বেরঙের শাক-সব্জি গজাতে থাকে। এতে নানা রকমের প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ উৎপন্ন হতে থাকে। আরও লক্ষণীয় যে,

ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন প্রান্তে উঁচু উঁচু অটল পাহাড় দিয়ে একে কিরূপে মযবুত করা হয়েছে এবং পাহাড়ের নীচে কিরূপে পানির ভান্ডার স্থাপন করা হয়েছে, যা নির্ঝরিণী ও নদী-নালার আকারে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে! এরপর এ পানির সাহায্যেই রকমারি বৃক্ষ, শস্য, আঙ্গুর, যয়তুন, খোরমা এবং বিভিন্ন আকার, রঙ, স্বাদ ও গন্ধের অসংখ্য ফলমূল উৎপন্ন করা হয়। এসব ফলমূল স্বাদে একটির চেয়ে অপরটি সেরা। অথচ এগুলো একই পানি দিয়ে সিঞ্চিত ও একই মাটি থেকে উৎপন্ন। এরপর চিন্তা করা দরকার আল্লাহ তা'আলা এসব ফলমূল ও উদ্ভিদের মধ্যে কত বিচিত্র উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। উদাহরণতঃ কোনটি খাদ্যের কাজ করে, কোনটি বলকারক, কোনটি জীবন রক্ষাকারী, কোনটি ঠাণ্ডা, কোনটি গরম, কোনটি পাকস্থলীতে পৌঁছে শিরা-উপশিরার ভেতর থেকে পিত্ত দূর করে, কোনটি স্বয়ং পিত্ত হয়ে যায়, কোনটি শ্লেষ্মানাশক, কোনটি শ্লেষ্মাবর্ধক, কোনটি রক্ত পরিষ্কারক এবং কোনটি শ্রম নিবারক।

রকম রকম জন্তু-জানোয়ারও অন্যতম নিদর্শন। এগুলোর মধ্যে কতক উড়ে, কতক ভূমিতে চলে। যারা চলে, তাদের মধ্যে কতক দু'পায়ে, কতক চার পায়ে, কতক দশ পায়ে এবং কতক একশ' পায়ে চলে। কোন কোন কীট-পতঙ্গের মধ্যে এমনটা দেখা যায়। এরপর পশু-পক্ষী, বন্য ও গৃহপালিত জীব-জন্তুর মধ্যে এত বেশী বিস্ময়কর বিষয়ের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, যেগুলো লিপিবদ্ধ করে শেষ করা যায় না। মশা, মাছি, পিঁপড়ে, মৌমাছি ও মাকড়সার মত ছোট প্রাণীর অত্যাশ্চর্য বিষয়াদি বর্ণনা করতে চাইলেও তা কারও পক্ষে নিঃশেষে বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। উদাহরণতঃ মাকড়সা নদীর তীরে নিজের ঘর নির্মাণ করে। প্রথমতঃ সে এমন দু'টি জায়গা তালাশ করে, তার মাঝে এক হাত অথবা তদপেক্ষা কম-বেশী ব্যবধান থাকে, যাতে উভয় জায়গায় সে মুখনিসৃত এঁটেল তার পৌঁছাতে পারে। এরপর সে মুখনিসৃত লালা অর্থাৎ তার এক জায়গায় স্থাপন করে, যা তৎক্ষণাৎ সেই জায়গার সাথে চিমটে যায়। অতঃপর সে অপর প্রান্তে গিয়ে সেখানেও তার লাগিয়ে দেয়। এরপর সে কয়েকবার আসা-যাওয়া করে এবং উপযুক্ত ব্যবধানে তার সংযোজন করতে থাকে। যখন উভয় জায়গায় তারের মাথা সংযোজিত হয়ে যায়, তখন সে প্রস্থের বুনন কাজ শুরু করে এবং দৈর্ঘের তারের উপর প্রস্থের তার রাখতে থাকে। যেখানে প্রস্থের তার দৈর্ঘের তারের উপর মিলিত হয়, সেখানে গিরা লাগায়।

এতেও সে জ্যামিতিক আকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এভাবে সে এমন একটি জাল তৈরী করে, যাতে মশা-মাছি আটকা পড়ে যায়। সে নিজে এক কোণে ওৎ পেতে বসে থাকে। কোন শিকার জালে আটকে গেলে তড়াক করে সেটিকে লুফে নেয় এবং খেয়ে ফেলে। এভাবে শিকার করে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন কোন প্রাচীরের কোণ তালাশ করে তার দু'প্রান্তে তার লাগিয়ে দেয়। এরপর আরও তারে সে নিজে ঝুলতে থাকে। ঝুলন্ত অবস্থায় সে মশা-মাছি ইত্যাদির অপেক্ষা করতে থাকে। কোন মাছি সেখানে এলে সে তাকে ধরে পায়ে তার জড়িয়ে দেয়। এরপর হযম করে ফেলে।

এখন প্রশ্ন হল, ক্ষুদ্র মাকড়সা এ নৈপুণ্য নিজে নিজেই আয়ত্ত করেছে, না কোন মানুষ তাকে বলে দিয়েছে অথবা শিখিয়েছে? না, তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। এমতাবস্থায় সেই কি তার স্রষ্টা। একি প্রজ্ঞাময়, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্য দেয় না? বিজ্ঞ ব্যক্তি এ ক্ষুদ্র প্রাণীর মধ্যে স্রষ্টার মহিমা, কুদরত ও প্রজ্ঞা দেখতে পায়। বৃহদাকার জন্তু-জানোয়ারের কথা না-ই বললাম। এ ধরনের ক্ষুদ্র প্রাণী অসংখ্য ও অগণিত। এগুলো দেখে আমাদের বিস্ময় না লাগার কারণ হচ্ছে, হরহামেশা প্রচুর পরিমাণে দেখা। দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। হ্যাঁ, যদি নতুন কোন জন্তু ও পোকা দেখি, তবে বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলি ঃ সোবহানাল্লাহ, কি অদ্ভুত প্রাণী!

পৃথিবীর স্থলভাগের যৎকিঞ্চিৎ আশ্চর্য বস্তু দেখার পর এখন জলভাগের বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার। জলভাগের বিস্তৃতি স্থলভাগের তুলনায় অনেক বেশী বিধায় এর আশ্চর্য বস্তুসমূহ স্থলভাগের আশ্চর্য বস্তুর চেয়ে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বেশী। সমুদ্রের কোন কোন জন্তু এত বিশালাকার যে, সেগুলোকে পানির উপরিভাগে দেখলে দ্বীপ বলেই ভ্রম হবে। ইতিহাসে এমনও প্রমাণ আছে যে, সমুদ্রে ভ্রমণকারীরা তিমি মাছের পিঠকে দ্বীপ মনে করে সেখানে নেমে পড়ে। এরপর আগুনের উত্তাপে তিমি যখন নড়াচড়া করতে থাকে, তখন বুঝতে পারে এটি একটি সামুদ্রিক জন্তু।

জীবজন্তুর যত প্রকার স্থলভাগে রয়েছে যেমন— গরু, ঘোড়া, মানুষ ইত্যাদি, তার চেয়ে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ এমনকি আরও অনেক বেশী প্রকার জলভাগে বিদ্যমান। এছাড়া সমুদ্রে কোন কোন প্রাণী এমনও আছে, যার নযীর স্থলভাগে পাওয়া যায় না। যারা সামুদ্রিক ভ্রমণের কষ্ট স্বীকার করে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাদের লিখিত বই-পুস্তকে এসব প্রাণীর আকার-আকৃতি দেখা যায়।

মোটকথা, সমুদ্রবক্ষে আল্লাহ তা'আলার এত বেশী অপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য কারিগরী রয়েছে যে, সেগুলো বৃহদাকারে কয়েকটি খণ্ডে বর্ণনা করেও শেষ করা যাবে না। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বিস্ময়কর ও প্রকাশ্যতম বস্তু হচ্ছে পানি। এটা বহমান, স্বচ্ছ, সংযুক্ত অংশবিশিষ্ট একটি শারীরিক বস্তু। এর গঠন অত্যন্ত নাযুক। দৃশ্যত এক বস্তু হলেও পৃথকীকরণকে এত দ্রুত গ্রহণ করে যেন আলাদাই। স্থলভাগের প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন এরই উপর নির্ভরশীল। যদি কোন মানুষ এক ঢোক পানির মুখাপেক্ষী হয় এবং তা তাকে পান করতে না দেয়া হয়, তবে তার মালিকানায় পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সবকিছু থাকলে সে তা ব্যয় করেও এক ঢোক পানি সংগ্রহ করবে। পান করার পর যদি প্রস্রাবের পথে তা বের করতে নিষেধ করা হয়, তবে তার জন্যেও সে পৃথিবীর সমস্ত ধনভাণ্ডার দিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে। আশ্চর্যের বিষয়, আল্লাহ তা'আলার এমন নেয়ামত সম্পর্কেও মানুষ চিন্তাভাবনা করে না। অথচ এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনার বিস্তর অবকাশ রয়েছে।

পানির পর আরও একটি চিন্তাভাবনার বিষয় হচ্ছে বায়ু। এই সূক্ষ্ম বস্তুটির অবস্থান নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে। চলাফেরার সময় দেহে লাগলে এর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়; কিন্তু চোখে দেখা যায় না। জলজ প্রাণী পানিতে হাত-পা নেড়ে যেমন সাঁতার কাটে, তেমনি পাখিরাও শূন্য মণ্ডলে পাখার সাহায্যে বায়ুকে চিরে সামনে এগিয়ে যায়। ঝড়ো হাওয়ার কারণে সমুদ্রে যেমন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠে, তেমনি ঝঞ্ঝাবাত্যার কারণে বায়ুর সমুদ্রে ঢেউ-এর সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা বায়ুকে গতিশীল করলে সে চলমান বায়ু হয়ে যায়। এরপর ইচ্ছা করলে তিনি একে বৃষ্টির সুসংবাদদাতা করে দেন। এরশাদ হয়েছে—

وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ

অর্থাৎ, আমি পানিভর্তি বায়ু পাঠাই। আবার ইচ্ছা করলে তিনি একে অবাধ্য মানুষদের জন্যে আযাবে পরিণত করে দেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেন ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ -

অর্থাৎ, আমি তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম এক ঝঞ্ঝাবায়ু, এক চরম দুর্ভাগ্যের দিনে। সেটা মানুষকে এমনভাবে উৎখাত করেছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর কাণ্ড।

বায়ু নাযুক ও সূক্ষ্ম। এতদসত্ত্বেও তার শক্তি ও বল এভাবে অনুমান করা যায় যে, বায়ুভর্তি কোন মশক যদি কেউ পানিতে ডুবিয়ে দিতে চায়, তবে তা সম্ভব হয় না। একারণেই ভারী জাহাজ ও নৌকা পানির উপর ভেসে থাকে— নিমজ্জিত হয় না। অতএব পবিত্র সে সত্তা, যিনি ভারী জাহাজকে কোনরূপ বন্ধন ছাড়াই পানির উপর আটকে রাখেন।

এছাড়া শূন্যমণ্ডলে আরও রয়েছে মেঘমালা, বজ্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বরফ, অগ্নিপিণ্ড ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কোরআন মজীদের অনেক আয়াতে এগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদাহরণতঃ

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ -

অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে নিয়োজিত মেঘমালা।

অন্যান্য আয়াতে বজ্র, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টিরও উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এগুলোর মধ্যে আমাদের অংশ যদি এতটুকুই থেকে থাকে যে, বৃষ্টিকে চোখে দেখে নিলাম এবং বজ্রকে কানে শুনে নিলাম, তবে এতে চতুষ্পদ জন্তুও তো আমাদের সাথে শরীক। অথচ আমাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের অধঃজগত থেকে উন্নতি করে উর্ধ্বজগতের বাসিন্দাদের সাথে শামিল হতে হবে। অর্থাৎ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলো দেখে নেয়ার পর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এগুলোর অভ্যন্তরীণ বিস্ময়কর বিষয়সমূহ অবলোকন করা দরকার। এক্ষেত্রেও চিন্তাভাবনা অনেক দূর অগ্রসর হতে পারে যদিও কিনারা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর নয়।

চিন্তাভাবনার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আকাশ ও তারকারাজির রহস্যাবলী। যদি কারও সকল বিষয় জানা হয়ে যায় এবং নভোমণ্ডলের রহস্যাবলী জানা না যায়, তবে বাস্তবে তার কিছুই জানা হল না। কারণ আকাশ ছাড়া পৃথিবী, সাগর-মহাসাগর, বায়ু ইত্যাদি যত কিছু রয়েছে, আকাশসমূহের তুলনায় সবগুলো যেন সাগরের তুলনায় এক ফোঁটা পানি; বরং এর চেয়েও ক্ষুদ্র। চিন্তার বিষয়, আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও তারকারাজির বিষয়টিকে কোরআন মজীদে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন। এমন

কোন সূরা নেই, যাতে এগুলোর বিরাটত্বের বিষয় উল্লিখিত হয়নি। কয়েক জায়গায় তো এগুলোর কসমও করা হয়েছে। যেমন—

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ

অর্থাৎ, কসম রাশিচক্র বিশিষ্ট আকাশের।

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ

অর্থাৎ কসম আকাশের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ

অর্থাৎ, কসম তরঙ্গায়িত আকাশের।

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَاهَا

অর্থাৎ, কসম আকাশের ও তার নির্মাণের।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا

অর্থাৎ, কসম সূর্যের ও তার কিরণের। কসম চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পর আবিভূত হয়।

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ

অর্থাৎ, আমি কসম করি ভ্রাম্যমাণ গ্রহ-নক্ষত্রের, যা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়।

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى

অর্থাৎ কসম নক্ষত্রের, যখন অস্তমিত হয়।

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ

অর্থাৎ, আমি কসম করি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের। অবশ্যই এটা এক মহা কসম যদি তোমরা জানতে।

অতএব, আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুর কসম করেছেন, তাতে যে কি পরিমাণ বিস্ময়কর বিষয়াদি রয়েছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি রিযিকও আকাশে আছে বলে উল্লেখ করেছেন।

এরশাদ হয়েছে—

وَفِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ -

অর্থাৎ, আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়।

তিনি আকাশ সম্পর্কে চিন্তাভাবনাকারীদের প্রশংসায় বলেন—

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ, এবং তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

ويل لمن قرأ هذه الاية ثم مسح بها سبته

অর্থাৎ, দুর্ভোগ সে ব্যক্তির, যে এ আয়াত পাঠ করে, অতঃপর গোঁফে তা দেয়।

অর্থাৎ, চিন্তাভাবনা না করেই এগিয়ে যায়। যারা সব নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের নিন্দা প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ مُعْرِضُوْنَ

অর্থাৎ, আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

এছাড়া পৃথিবীস্থ সবকিছু দ্রুত বদলে যায়; কিন্তু আকাশ শক্ত-অটল ও অপরিবর্তনশীল। নির্ধারিত সময় এলেই কেবল এতে পরিবর্তন হবে। এরশাদ হয়েছে—

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

অর্থাৎ, আমি তোমাদের মাথার উপর সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছি।

অতএব, এগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত, যাতে উর্ধ্বজগতের আশ্চর্য বস্তুসমূহ দৃষ্টিতে ভেসে উঠে। মনে রেখ, উর্ধ্বজগত দেখার উদ্দেশ্য এই নয় যে, চোখ তুলে আকাশের নীলাভ রঙ এবং তারকারাজির কিরণ দেখে নিলাম। এরূপ দেখার মধ্যে চতুষ্পদ জন্তুও আমাদের সাথে শরীক। এমন দেখাই উদ্দেশ্য হলে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশংসায় নিম্নোক্ত আয়াতে কেন বলেছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি ইবরাহীমকে দেখাই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সাম্রাজ্য।

অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, উর্ধ্বজগত সম্পর্কে খুব চিন্তাভাবনা করতে থাক। এতে করে হয়তো তোমার জন্যে আকাশসমূহের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তখন তুমি নিজের অন্তর দ্বারা চারপাশে পায়চারি করতে পারবে। অবশেষে তোমার অন্তর আল্লাহর আরশের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। তখন আশা করা যায় তুমি হযরত ওমর (রাঃ)-এর মর্তবায় পৌঁছে যাবে, যিনি এরশাদ করেন— আমার অন্তর আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছে।

মোটকথা, এরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রত্যেকটি তারকার সৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা অনেক হেকমত রেখেছেন। এর আকারে, বর্ণে, আকাশ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থানে এবং বিষুবরেখা ও পার্শ্ববর্তী তারকা থেকে দূরে বা কাছে থাকার মধ্যে অসংখ্য হেকমত রয়েছে। একথা সবাই জানে যে, এ সুবিশাল পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সূর্যের বিস্তৃতি এই পৃথিবীর তুলনায় একশ' ষাট গুণেরও বেশী। হাদীস থেকেও সূর্যের বিশালত্ব বুঝা যায়। যে তারকাকে আমাদের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র মনে হয়, সেগুলোর ক্ষুদ্রতম তারকাটিও পৃথিবীর চেয়ে আটগুণ বড়। আর বৃহত্তমটির তো কথাই নেই। এ থেকে তারকাসমূহের পৃথিবী থেকে ব্যবধান ও উচ্চতা অনুমান করা যায়। আল্লাহ তা'আলা এ দূরত্বের প্রতি

এভাবেই ইঙ্গিত করেছেন— رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا অর্থাৎ, তিনি আকাশকে উঁচু ও বিন্যস্ত করেছেন। হাদীসে আছে, প্রত্যেক আকাশ থেকে অপর আকাশের ব্যবধান পাঁচশ' বছরের পথ।

অতএব, আকাশ ও তারকারাজির স্রষ্টার প্রতি লক্ষ্য করা উচিত যে, তিনি কিভাবে এগুলো সৃষ্টি করেছেন! কেমন করে খুঁটি ও বন্ধন ছাড়াই এগুলোকে স্থিতিশীল রেখেছেন। সমগ্র পৃথিবী একটি গ্রহ সদৃশ, যার ছাদ হল আকাশ। আশ্চর্যের বিষয়, আমরা যখন কোন বিত্তবান ব্যক্তির বাসভবনে যাই এবং তাকে বিচিত্র রঙের আসবাবপত্র ও সোনালী তৈজসপত্র দ্বারা সুসজ্জিত দেখি, তখন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়ি।

কিন্তু বিশ্বরূপী এ বিশাল বাসভবনের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে কখনও বিস্মিত হই না। এ বিশাল বাসভবনটি আমরা সর্বক্ষণ দেখি। এর ভূমি, আলো, বাতাস, নীলাভ ছাদ, বিরল জীব-জানোয়ার, বিচিত্র নকশা ইত্যাদি প্রত্যহ দেখেও অন্তর দিয়ে সেদিকে মনোনিবেশ করি না। আমরা বিত্তবান ব্যক্তির যে ঘরের প্রশংসা করি, আল্লাহর ঘর কি তার চেয়ে কোন অংশে কম? বরং সেটা তো এ আলীশান ঘরেরই একটি সামান্য অংশ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা এ সুবিশাল ঘরের দিকে তাকাই না। কারণ, আমরা আমাদের পালনকর্তা, তাঁর নির্মিত ঘর ও অন্যান্য সবকিছুকে ভুলে কেবল পেট ও পিঠের ধান্দায় আপাদমস্তক ডুবে রয়েছি।

এ পর্যন্ত চিন্তাভাবনার কয়েকটি পথ সংক্ষেপে বর্ণিত হল। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের চিন্তাভাবনা এসব পথেই বিচরণ করে। এতে স্রষ্টার সত্তা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার বর্ণনা নেই। তবে সৃষ্টি সম্পর্কে যথাযথ চিন্তা করলে স্রষ্টার মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও কুদরতের পরিচয় অবশ্যই অর্জিত হয়ে যায়। সৃষ্টির মারেফত তথা পরিচয় যত বেশী হয়, স্রষ্টার মারেফত ততই পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। আমরা যদি কোন কবির কবিতা পাঠ করে তাকে বড় বলে বিশ্বাস করি, তবে তার ফল এই হবে যে, যখনই তার কোন রচনা ও কবিতা আমরা পাঠ করব, তখনই তার মারেফত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তাকে সম্মানও বেশী করব। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করার অবস্থাও তদ্রূপ।

আল্লাহ তা'আলা নিজের রহমত ও কৃপায় আমাদেরকে চিন্তাশক্তি দান করুন এবং মূর্খদের পদস্খলন থেকে রক্ষা করুন! আমীন!

দশম অধ্যায়

মৃত্যু ও মৃত্যুর পর

যার বিচ্ছেদ মুহূর্ত মৃত্যু, যার নিদ্রাস্থল মাটির শয্যা, যার প্রিয় সঙ্গী সরীসৃপ, যার সহচর মুনকার-নকীর, যার বাসস্থান কবর, যার বিশ্রামাগার ভূগর্ভ, যার প্রতিশ্রুত স্থান কিয়ামত এবং বেহেশত অথবা দোযখ যার অবতরণস্থল, তার জন্যে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন কিছু চিন্তা করা, অন্য কোন কিছু নিয়ে আলোচনা করা, অন্য কোন কিছুর প্রস্তুতি নেয়া এবং অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা করা মোটেই শোভনীয় নয়। তার উচিত নিজেকে মৃত ও কবরবাসীদের মধ্যে গণ্য করা। কেননা, যা আসন্ন তা খুবই নিকটবর্তী। দূরে তা-ই, যা কখনও আসবে না। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—বিজ্ঞ সেই, যে নিজের নফসকে দাবিয়ে রাখে এবং মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্যে আমল করে। বলা বাহুল্য, যে পর্যন্ত কোন বিষয় মনে বার বার স্মরণ না হয়, সে পর্যন্ত সে বিষয়ের প্রস্তুতি হতে পারে না। মনে বার বার স্মরণ তখন হয়, যখন এমন বিষয়বস্তু অব্যাহতভাবে শুনতে থাকে, যা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই আমরা মৃত্যু, তার পরবর্তী বিষয়াদি তথা আখেরাত, কিয়ামত, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করছি, যাতে বান্দা প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহিত হয়। কারণ সফরের সময় আসন্ন এবং মানুষ অলস নিদ্রায় আচ্ছন্ন। যেমন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করা ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার কাজে নিমজ্জিত ও উদ্‌ভ্রান্ত, তার অন্তর মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন। ফলে, সে মৃত্যুকে স্মরণ করে না। কেউ তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে সে বিরক্তিবোধ করে এবং মৃত্যুর স্মরণকে ঘৃণা করে। এধরনের লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ হে রসূল, বলে দিন, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াও, তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। এরপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

মানুষ তিন প্রকার ঃ (১) দুনিয়ায় নিমজ্জিত, (২) তওবাকারী ও (৩) সিদ্ধি লাভকারী সাধক। প্রথম প্রকার মানুষ মৃত্যুকে স্মরণ করে না। করলেও দুনিয়ার বিষয়ে পরিতাপের কারণে করে। তখন সে মৃত্যুর নিন্দা করতে শুরু করে। মৃত্যুর স্মরণ এ ধরনের লোককে আল্লাহ তা'আলা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়। তওবাকারী ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে, যাতে তার মনে ভয়ের উদ্রেক হয় এবং তওবা পূর্ণতা লাভ করে। মাঝে মাঝে সে মৃত্যুকে খারাপ মনে করে এ আশংকায় যে, না জানি তওবা পূর্ণ হওয়া ও উপযুক্ত পাথেয় সংগৃহীত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু এসে পড়ে। এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুকে খারাপ মনে করার ব্যাপারে ক্ষমার্হ। সে এই হাদীসের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয় من كره لقاء الموت كره الله لقائه (যে মৃত্যুর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।)কারণ, সে মৃত্যুকে এবং আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতকে খারাপ মনে করে না। বরং এর পরিচয় নিজের ত্রুটির কারণে ভয় করে যে, না জানি আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাত নসীব না হয়। এর পরিচয় এই যে, সে সর্বক্ষণ পাথেয় সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকবে। এ ছাড়া অন্য কোন কাজ করবে না। অন্যথায় সে প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

সিদ্ধি লাভকারী সাধক সর্বক্ষণ মৃত্যুকে স্মরণ করে। কেননা, মৃত্যুর উপরই প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের ওয়াদা। প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের ওয়াদা কখনও ভুলে না। এরূপ ব্যক্তি দ্রুত মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয়, তার আগমনে খুশী হয় এবং মৃত্যুকে প্রিয় জ্ঞান করে, যাতে গোনাহগারদের স্থান থেকে রেহাই পেয়ে পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যেতে পারে। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন ঃ প্রিয়জন প্রয়োজনের সময় এসেছে। যে অনুতপ্ত হয়, তার যেন সফলতা নসীব না হয়। ইলাহী, তুমি জান, প্রাচুর্যের তুলনায় আমি দারিদ্র্যকে পছন্দ করি, সুস্থতার তুলনায় অসুস্থতা এবং জীবনের তুলনায় মৃত্যুকে অধিক ভালবাসি। অতএব, আমার জন্যে মৃত্যুকে সহজ কর, যাতে আমি তোমার সাথে মিলিত হতে পারি।

তওবাকারী মৃত্যুকে খারাপ জ্ঞান করার ব্যাপারে ক্ষমাযোগ্য, আর সাধক মৃত্যুকে ভাল জানা ও তার বাসনা করার ব্যাপারে ক্ষমাযোগ্য। তবে তাদের উভয়ের চাইতে উত্তম সে ব্যক্তি, যে ভাল ও মন্দ জানার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার কাছে সমর্পণ করে। তার কাছে মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে তাই অধিক প্রিয়, যা আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক প্রিয়। এরূপ ব্যক্তি মহব্বত ও এশকের আতিশয্যে 'তাসলীম' ও রেযা' (আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি)-এর স্তরে পৌঁছে যায়।

মোটকথা, মৃত্যুকে স্মরণ করার মাঝেও সওয়াব রয়েছে। কেননা, দুনিয়াতে নিমজ্জিত ব্যক্তিও মৃত্যুকে স্মরণ করে লাভবান হয়। অর্থাৎ, সে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ, মৃত্যুর স্মরণ তার সুখ ও আরামকে মলিন এবং আয়েশকে তিক্ত করে দেয়। যেসব বিষয়ে মানুষের আনন্দ ও খাহেশ তিক্ত হয়, সেগুলোই নাজাতের কারণ।

মৃত্যুকে স্মরণ করার ফযীলত ঃ রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

اكثروا من ذكرهاذم اللذات

অর্থাৎ, তোমরা আনন্দ-উল্লাস ছিন্নকারীকে অধিক স্মরণ কর।

এর মর্ম মৃত্যুকে স্মরণ করে নিজের আনন্দ-উল্লাসকে বিমলিন কর, যাতে এর প্রতি তোমাদের আগ্রহ না থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগী হও। তিনি আরও বলেন— যদি গৃহপালিত পশু জানত, যা তোমরা জান, তবে তারা কখনও মোটা-তাজা হত না। অর্থাৎ, ক্ষীণ ও কৃশ হয়ে যেত। হযরত আয়েশা (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) -কে প্রশ্ন করলেন— শহীদদের সাথে কি কেউ উত্থিত হবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, যে মৃত্যুকে দিবারাত্রি বিশ বার স্মরণ করে। এসব ফযীলতের কারণ, মৃত্যুর স্মরণ দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা ও আখেরাতের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার উপায়। এক হাদীসে আছে—

تحفة المؤمنين الموت

অর্থাৎ, মৃত্যু মুমিনদের উপঢৌকন।

কেননা, দুনিয়া ঈমানদার ব্যক্তির জন্য জেলখানা। সে সর্বদা দুঃখ-কষ্ট এবং নফস ও শয়তানের তরফ থেকে বিপদে পতিত থাকে। মৃত্যুর

ফলস্বরূপ সে এ আযাব থেকে নিষ্কৃতি পায়। এই নিষ্কৃতি তার জন্যে উপঢৌকন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

الموت كفارة لكل مسلم

অর্থাৎ, মৃত্যু প্রত্যেক মুসলমানের কাফফারা।

এখানে সাচ্চা মুসলমান ও পাকা ঈমানদার বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে ঈমানদারের চরিত্র বিদ্যমান এবং যে সগীরা গোনাহ ও ছোটখাটো বিচ্যুতি ছাড়া কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয় না। সে যদি ফরয কর্মের উপর কায়েম থাকে, তবে তার ছোট ছোট গোনাহের জন্যে মৃত্যু কাফফারা হয়ে যায়।

আতা খোরাসানী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক মসলিসের কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। মজলিস থেকে অট্টহাসির শব্দ তাঁর কানে এলে তিনি বললেন ঃ তোমরা মজলিসে আনন্দ মলিনকারীর আলোচনাও শামিল করে নাও। লোকেরা আরয করল ঃ আনন্দ মলিনকারী কি? তিনি বললেন ঃ মৃত্যু। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন—

اكثروا من ذكر الموت فانه يمحو الذنوب ويزهدفى الدنيا

অর্থাৎ, তোমরা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ কর। এটা গোনাহকে মিটিয়ে দেয় এবং দুনিয়া বিমুখ করে।

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে এসে কিছু লোককে হাসতে দেখলেন। তিনি বললেন ঃ মৃত্যুকে স্মরণ কর। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তবে হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তির কথা উঠল। লোকেরা তার খুব প্রশংসা গাইল। তিনি বললেনঃ তোমাদের সে সহচর মৃত্যুকে কেমন স্মরণ করত? তারা বলল ঃ আমরা তাকে মৃত্যুকে স্মরণ করতে কখনও শুনিনি। তিনি বললেন ঃ তাহলে সে সেই মর্তবার নয়, যে মর্তবার তোমরা তাকে মনে করছ।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ জনৈক আনসারী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ লোকদের মধ্যে অধিক বিজ্ঞ ও মহৎ কে? তিনি বললেন ঃ যে মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে। এর জন্যে অধিক প্রস্তুতি নেয়।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ মৃত্যু দুনিয়াকে লাঞ্ছিত করে দিয়েছে এবং বুদ্ধিমানের জন্যে খুশীর নাম-গন্ধ রাখেনি। রবী' ইবনে খায়ছাম (রহঃ) বলেন ঃ ঈমানদার যদি কোন কিছুর অপেক্ষা করে, তবে মৃত্যুর চেয়ে উত্তম তার জন্যে আর কিছু নেই। তিনি বলতেন ঃ আমি মরে গেলে কাউকে খবর দিয়ো না। আস্তে আমাকে মাবুদের দিকে সরিয়ে দেবে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) প্রত্যহ রাত্রিবেলায় আলেমগণকে একত্রিত করতেন, যাতে তারা মৃত্যু, আখেরাত ও কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেন। এতে তাঁর মনে হত যেন, সামনে জানাযা নিয়ে বসে আছেন। ইবরাহীম তায়মী (রহঃ) বলেন ঃ দু'টি বস্তু আমার নিকট থেকে দুনিয়ার আনন্দকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে— একটি মৃত্যুর স্মরণ; অপরটি আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানোর চিন্তা। আশআছ (রহঃ) বলেন ঃ আমরা হাসান বসরীর কাছে গেলে কেবল দোযখ ও আখেরাতের ব্যাপার এবং মৃত্যুর আলোচনা পেতাম। হযরত সফিয়্যা (রাঃ) বলেন ঃ জনৈকা মহিলা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর কাছে এসে নিজের অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন ঃ মৃত্যুকে স্মরণ কর। তোমার মন নম্র হয়ে যাবে। সে তাই করল এবং দিল নরম হয়ে গেল। এরপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য হযরত আয়েশার কাছে আগমন করল। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয এক আলেমকে বললেন ঃ আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ শাসকদের মধ্যে আপনিই প্রথমে মৃত্যুবরণ করবেন না। অর্থাৎ, আপনার পূর্বে আরও অনেক শাসক মারা গেছেন। তিনি বললেন ঃ আরও বলুন। আলেম বললেন ঃ আদম (আঃ) পর্যন্ত আপনার কোন পিতৃপুরুষ এমন নেই, যে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেনি। এখন আপনার পালা। হযরত ওমর একথা শুনে কেঁদে ফেললেন।

রবী' ইবনে খায়ছাম ঘরে একটি কবর খুদে রেখেছিলেন। প্রত্যহ কয়েকবার সে কবরে শয়ন করে তিনি মৃত্যুর স্মৃতিকে অম্লান রাখতেন। তিনি বলতেন— যদি এক মুহূর্তও মৃত্যুর স্মরণ আমার মন থেকে উধাও হয়ে যায়, তবে মন খারাপ হয়ে যাবে। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ মৃত্যু সুখী মানুষদের সুখে ফাটল ধরিয়ে দেয়। অতএব, এমন সুখ অন্বেষণ কর, যা ধ্বংস হয় না।

মৃত্যু এক ভয়াবহ আশংকা সত্ত্বেও মানুষ এ থেকে উদাসীন। এর কারণ, তারা এর চিন্তা কম করে এবং একে স্মরণ করে না। কেউ স্মরণ করলেও মুক্ত মনে করে না; বরং নানা কামনা-বাসনায় তাদের মন ভর্তি থাকে। ফলে, মৃত্যুর স্মরণ অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মৃত্যুকে স্মরণ করার পদ্ধতি এই যে, অন্তরকে মৃত্যুর স্মরণ ছাড়া সবকিছু থেকে মুক্ত করে নিবে; যেমন কোন মুসাফির জাহাজ যোগে সমুদ্র ভ্রমণ করতে চাইলে সে ভ্রমণ ছাড়া অন্য কিছুই চিন্তা করে না। এভাবে মৃত্যুর স্মরণ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে প্রভাব হওয়া বিচিত্র নয়।

এ ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী পন্থা হল, সমকক্ষ ও সমসাময়িক মৃত ব্যক্তিদেরকে স্মরণ করা অথবা তাদের মৃত্যু ও বিচ্ছেদকে মনে মনে কল্পনা করা। এভাবে চিন্তা করা যে, এখন তাদের সুন্দর দেহ মাটিতে মিশে গেছে। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কবরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তারা কিভাবে স্ত্রীদেরকে বিধবা এবং সন্তানদেরকে এতীম করে চলে গেছে! তাদের বৈঠকসমূহ কিভাবে উজাড় হয়ে গেছে। এভাবে এক এক জনকে আলাদা আলাদাভাবে স্মরণ করবে। আরও ধ্যান করবে, তারা কিভাবে চলাফেরা করত! এখন তাদের পদযুগল ও দেহের সকল গ্রন্থি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। তারা কিভাবে কথা বলত এবং হাসত! এখন কীট-পতঙ্গ তাদের জিহ্বা খেয়ে ফেলেছে। মাটি তাদের দাঁত খেয়ে ফেলেছে। তারা নিজেদের জন্যে এমন কৌশল অবলম্বন করত, যা বিশ বছর পর্যন্ত তাদের অভাব মোচন করে দিতে পারে। অথচ তাদের মরণের মাত্র এক মাসই অবশিষ্ট থাকত। হঠাৎ মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত এবং কর্ণকুহরে বেহেশত অথবা দোযখের পয়গাম পৌঁছে দিত। এরূপ চিন্তা করার পর নিজের সম্পর্কে চিন্তা করবে— আমিও তো তাদের মতই একজন। তারা যেমন গাফেল ছিল, আমিও তেমনি গাফেল। তাদের যে পরিণতি হয়েছে, আমারও তাই হবে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ যখন তুমি মৃতদেরকে স্মরণ করবে, তখন নিজেকে তাদেরই মত গণ্য করবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ সে ব্যক্তিই সৎ, যে অপরের কাছ থেকে উপদেশপ্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ অপরের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

মোটকথা, সর্বদা এ ধরনের চিন্তা করা, কবরস্তানে যাওয়া এবং অসুস্থ লোকদেরকে দেখার মাধ্যমে মৃত্যুর স্মরণ অন্তরে সজীব হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এমন প্রবল হয় যে, সদা সর্বদা চোখের সামনে থাকে। এমতাবস্থায় মানুষ দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ

করে। শুধু মৌখিক স্মরণে উপকার কমই হয়। দুনিয়ার কোন বস্তু পেয়ে যখন মানুষের মন পুলকিত হয়ে উঠে, তখনই স্মরণ করা দরকার যে, এ বস্তুটি অবশ্যই ছেড়ে যেতে হবে। ইবনে মুতী একদিন নিজের ঘরের দিকে তাকালেন। ঘরের সৌন্দর্য তাঁর মনকে আকৃষ্ট করল। তিনি তৎক্ষণাৎ কেঁদে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, যদি মৃত্যু না হত, তবে আমি তোকে দেখে প্রফুল্ল হতাম।

আশা সংক্ষিপ্ত করা ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে এরশাদ করেছেন— যখন তোমার ভোর হয়, তখন নিজেকে বিকেলের আলোচনা শুনিয়ো না এবং বিকেল হলে সকালের আলোচনা করো না। জীবন থেকে মৃত্যুর জন্যে কিছু নিয়ে নাও এবং সুস্থতা থেকে অসুস্থতার জন্যে। হে আবদুল্লাহ, তোমার জানা নেই আগামী কাল তোমার কি নাম হবে— জীবিত না মৃত? হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, আমি তোমাদের জন্যে দু'টি অভ্যাসের আশংকা বেশী করি— একটি খেয়াল-খুশীর অনুসরণ ও অপরটি দীর্ঘ আশা। খেয়াল-খুশীর অনুসরণ মানুষকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। আর দীর্ঘ আশা হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত। খবরদার, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া তাকেও দেন যাকে মহব্বত করেন এবং তাকেও দেন যাকে অপছন্দ করেন। আর আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন তাকে ঈমান দেন। মনে রেখো, কিছু লোক দ্বীনের যোগ্য এবং কিছু লোক দুনিয়ার যোগ্য। তোমরা দুনিয়াদার না হয়ে দ্বীনদার হয়ে যাও। দুনিয়া মুখ ফিরিয়ে গত হয়ে গেছে এবং আখেরাত এগিয়ে আসছে। খবরদার, তোমরা আমল করার দিনে আছ, যাতে হিসাব-নিকাশ নেই। কিন্তু অচিরেই তোমরা হিসাব-নিকাশের দিনে থাকবে। তখন আমল হবে না।

উম্মে মুনযির বলেন— রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক সন্ধ্যায় লোকজনের কাছে গিয়ে বললেন ঃ তোমাদের কি লজ্জা-শরম নেই? তারা আরয করল ঃ হুযুর, এ কি কথা। তিনি বললেন ঃ তোমরা এমন সামগ্রী সংগ্রহ কর, যা খাও না। এমন সব আশা কর, যা পাও না। এমন ঘর নির্মাণ কর, যাতে বসবাস কর না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ উসামা ইবনে যায়েদ একশ' দীনারের বিনিময়ে এক মাসের বাকীতে একটি বাঁদী খরিদ করলেন। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনলাম— তোমরা কি বিস্মিত

হও না যে, উসামা এক মাসের ওয়াদায় বাঁদী খরিদ করেছে? নিঃসন্দেহে সে দীর্ঘ আশা করে। কসম সে সত্তার, যার কবযায় আমার প্রাণ, আমি আমার দুচোখ কখনও এই বিশ্বাস না নিয়ে খুলি না যে, বন্ধ করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা আমার রূহ কবয করে নেবেন। আমি এরূপ বিশ্বাস নিয়েও লোকমা মুখে দেই না যে,মৃত্যুর পূর্বেই তা গলাধঃকরণ করে ফেলব। হে আদম সন্তান, তোমরা জ্ঞানী হলে নিজেদেরকে মৃতদের মধ্যে গণ্য কর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন— রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্রাবের জন্যে যেতেন। প্রস্রাব করে তিনি মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে নিতেন। আমি আরয করতাম— হুযুর, পানি তো আপনার কাছেই রয়েছে। তিনি বলতেন— পানি পর্যন্ত পৌঁছতে পারব— এর কোন নিশ্চয়তা আছে কি?

বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার তিনটি কাঠি নিলেন। একটি নিজের সামনে গাড়লেন, অপরটি তাঁর কাছে এবং তৃতীয়টি দূরে গাড়লেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা জান এগুলো কি? উত্তরে আরয করা হলো ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ আমার সামনের কাঠিটি মানুষ। এর নিকটস্থ কাঠিটি তার মৃত্যু। আর দূরের কাঠিটি হচ্ছে মানুষের আশা। মানুষ এর সাথে সম্পর্ক রাখে, কিন্তু মৃত্যু সে পর্যন্ত পৌঁছতে দেয় না। মাঝপথেই জীবনের অবসান ঘটে। এক হাদীসে আছে, মানুষের আশেপাশে নিরানব্বইটি মৃত্যু রয়েছে। সে এগুলো থেকে বেঁচে গেলেও বার্ধক্যের কবলে পড়ে যায়। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এটা মানুষ, আর তার চারপাশে এগুলো তার মৃত্যু। তার দিকে ফণা তুলে রয়েছে। যার প্রতি হুকুম হয়, সেই মানুষকে ধরে বসে। যদি মানুষ এসব মৃত্যু থেকে বেঁচে যায়, তবে বার্ধক্য এসে তার জীবনাবসান ঘটায়। যার আশায় সে কেবল অপেক্ষাই করে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রেওয়ায়েত করেন— রসূলে করীম (সাঃ) আমাদেরকে বুঝানোর জন্যে একটি চতুর্ভুজ-রেখা আঁকলেন। অতঃপর তার মাঝখানে একটি রেখা টেনে আশেপাশে আরও কয়েকটি রেখা টানলেন। চতুর্ভুজের বাইরেও একটি রেখা টেনে বললেন ঃ তোমরা জান এগুলো কি? আমরা আরয করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি মাঝখানের রেখাকে মানুষ বললেন এবং চতুর্ভুজকে মৃত্যু বললেন, যা মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আশেপাশের রেখাগুলোকে তিনি বিপদাপদ বলে আখ্যায়িত করলেন, যা মানুষকে আঁচড়াতে থাকে। একটি

আঁচড়ানো ভুলে গেলে অপরটি আঁচড়িয়ে নেয়। আর বাইরের রেখাটিকে তিনি নাম দিলেন আশা।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন—

يهرم ابن ادم ويبقى معه اثنتان الحرص والامل

অর্থাৎ, মানুষ বুড়ো হয়ে যায় এবং তার সাথে দু'টি জিনিস অবশিষ্ট থাকে— লালসা ও আশা।

এক রেওয়ায়েতে আছে—

وتشب معه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر -

অর্থাৎ, আর যুবক হয় তার সাথে দুটি জিনিস— অর্থের লালসা ও জীবনের লালসা।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) এক জায়গায় বসে ছিলেন। কাছেই এক বৃদ্ধ কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। তিনি আল্লাহর দরবারে আরয করলেন— ইলাহী, এব্যক্তি থেকে আশা দূর করে দাও। বৃদ্ধ কোদাল ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়ল এবং এক ঘন্টা পড়ে রইল। হযরত ঈসা (আঃ) আবার দোয়া করলেন— ইলাহী, তার আশা তাকে ফিরিয়ে দাও। বৃদ্ধ উঠে কাজ করতে লাগল। হযরত ঈসা (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পূর্বে কেন শুয়ে রইলে এবং এখন কেন কাজ শুরু করেছ?

সে বলল ঃ কাজ করতে করতে আমার নফস আমাকে বলল, তুমি বুড়ো হয়ে গেছ। এখন কাজ করছ কেন? তাই আমি কোদাল ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। এখন আমার নফস আমাকে বলল, যে পর্যন্ত জীবিত আছ, দিনাতিপাতের চিন্তা করতেই হবে। তাই উঠে কাজ শুরু করেছি।

হযরত হাসানের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা সবাই কি জান্নাতে যাওয়া পছন্দ কর? উত্তর হল ঃ জী হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ তাহলে জীবনের লালসা কম কর এবং মৃত্যুকে চোখের সামনে প্রতিষ্ঠিত করে নাও। রসূলে করীম (সাঃ) দোয়ায় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ دُنْيَا تَمْنَعُ خَيْرَ الْاٰخِرَةِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ حَيَاةٍ تَمْنَعُ خَيْرَ الْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَمَلٍ يَمْنَعُ خَيْرَ الْعَمَلِ

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এমন দুনিয়া থেকে, যা আখেরাতের কল্যাণ লাভে বাধা হয়, এমন জীবন থেকে, যা মৃত্যুর কল্যাণ থেকে বিরত রাখে এবং এমন আশা থেকে, যা আমলের কল্যাণলাভে প্রতিবন্ধক হয়।

মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ আমি কবে মরব তা যদি জানা থাকত, তবে আমার জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীনতা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এ উদাসীনতা না থাকলে জীবন যাপন ভালরূপে হত না এবং বাজারও জমত না।

হযরত হাসান বলেন ঃ ভুলে যাওয়া এবং আশা— এ দুটি মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিরাট নেয়ামত। এ দুটি না থাকলে মুসলমান পথে বের হতে পারত না।

হযরত ছওরী বলেন ঃ সংসারের প্রতি উদাসীনতাই হচ্ছে আশা খাটো করা— মোটা খাওয়া ও কম্বল পরিধান করা নয়।

কথিত আছে, শকীক বলখী (রহঃ) নিজের ওস্তাদ আবু হাশেম রোমানীর কাছে আগমন করলেন। তাঁর চাদরের কোণে কিছু বাঁধা ছিল। ওস্তাদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার চাদরের কোণে ওটা কি? তিনি বললেন ঃ আমার এক ভাই কিছু বাদাম দিয়ে বলেছে এর দ্বারা ইফতার করলে সে খুশী হবে। ওস্তাদ বললেন ঃ শকীক তুমি মনে মনে একথা বল যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিত থাকবে! তোমার সাথে আমার কোন কথা নেই, যাও। শকীক বলেন ঃ ওস্তাদ একথা বলে দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে রইলেন।

আশার কারণ ও প্রতিকার ঃ দীর্ঘ আশার কারণ হল দুনিয়ার মহব্বত। মানুষ যখন দুনিয়ার মহব্বতে লিপ্ত হয়, তখন তার মনে দুনিয়ার বিচ্ছেদ খুব কষ্টকর হয়। সে তখন মৃত্যুকে ঘৃণা করতে থাকে। মানুষ যাকে ঘৃণা করে, তাকে সর্বদাই দূরে সরিয়ে রাখে এবং মিথ্যার আশ্রয়ে নিজেকে

জড়িয়ে রাখে। ফলে, তার মন সে আশার ভেতরেই আবদ্ধ থাকে, মৃত্যুর কথা স্মরণ থাকে না। যদি কোন কারণে মৃত্যু ও তার প্রস্তুতির কথা মনে উদয় হয়, তবে তার নফস তাকে বলে— এখনও অনেক দিন বাকী রয়েছে। বড় হয়ে তওবা করে নিয়ো। যখন মানুষ বড় হয়, তখন নফস বলে বুড়ো হয়ে তওবা করে নিয়ো। যখন বুড়ো হয়ে যায়, তখন নফস বলে— এ ঘর নির্মাণ শেষ করে অথবা এ সফর থেকে ফিরে এসে অথবা পুত্র-কন্যার বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেলে তওবা করে নিয়ো।

মোটকথা, এমনিভাবে নফস মৃত্যুর প্রস্তুতিকে বিলম্বিত করতে থাকে। অথচ যে কাজ শুরু করে, তা পূর্ণ করতে আরও দশ কাজ বের হয়ে আসে। এভাবে একের পর এক দিন অতিবাহিত হতে থাকে, কিন্তু প্রস্তুতি হয়ে উঠে না। অবশেষে মৃত্যু এমন সময় এসে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে যার ধারণাও সে করে না। তখন অনুতাপ ও আফসোস ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। বেচারী মানুষ জানে না, যে কারণে আজ বিলম্বিত করে, তা কালও থাকবে; বরং সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তা আরও মযবুত হয়ে যাবে। মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্যে কোন না কোন সময় অবসর পাওয়া যাবে—এরূপ ধারণা করা খামখেয়ালী বৈ কিছু নয়। তবে যে আশা খাটো করে, সে-ই অবসর পায়।

মানুষ প্রায়শ নিজের যৌবনের উপর ভরসা করে এবং যৌবনে মৃত্যু আসাকে অবান্তর মনে করে। সে চিন্তা করে না যে, তার এলাকার বুড়োদেরকে গণনা করলে দশ-পাঁচ জনের বেশী হবে না। তাদের সংখ্যা কম হওয়ার একমাত্র কারণ যৌবন অবস্থায় মৃত্যু বেশী হওয়া। যতদিনে একজন বুড়ো মানুষ মৃত্যুবরণ করে, ততদিনে হাজারো যুবক ও শিশু মারা যায়।

মানুষ কখনও নিজের সুস্বাস্থ্যের কারণে মৃত্যুকে অবান্তর জ্ঞান করে এবং হঠাৎ মৃত্যুর আগমনকে কঠিন মনে করে। সে জানে না, সহসা মৃত্যু হওয়া কঠিন ব্যাপার নয়। রোগ-ব্যাধি তো সহসাই হয়ে থাকে। রোগী হয়ে গেলে মৃত্যু আর কত দূরে থাকে! যদি গাফেল মানুষ চিন্তা করে যে, মৃত্যুর জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট নেই— যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে যেকোন সময় মৃত্যু আসতে পারে, এর জন্যে কোন ঋতুও নির্দিষ্ট নেই— শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও বসন্তে আসতে পারে এবং দিবারাত্রিও নির্দিষ্ট নেই, তবে অবশ্যই সে মৃত্যুর প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু সে তো মূর্খতা ও

দুনিয়ার মোহে পড়ে দীর্ঘ আশার হাতে গ্রেফতার হয়ে সর্বদা একথাই মনে করে যে, মৃত্যু তার সামনেই হবে। তার ধারণা, সে জানাযার সাথে চলবে; কিন্তু তার জানাযার সাথেও যে মানুষ চলবে তা কল্পনা করে না। এর প্রতিকার হল নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করা এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, তার জানাযাও উঠবে এবং তাকেও কবরে দাফন করা হবে— যেমন অন্যকে করা হয়। এমতাবস্থায় মৃত্যুর প্রস্তুতি বিলম্বিত করা নিরেট মূর্খতা।

অতএব, বিলম্বিত করার প্রতিকার হল মূর্খতার অবসান এবং দুনিয়ার মোহ বর্জন। মূর্খতা এভাবে দূর করবে যে, উপস্থিত মন নিয়ে সাফ চিন্তা করবে এবং পূর্ণ জ্ঞানের কথাবার্তা সৎলোকদের কাছ থেকে শ্রবণ করবে। দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা অবশ্য কঠিন কাজ। এটা দুরারোগ্য ব্যাধি। এর চিকিৎসায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। এর চিকিৎসা এটাই যে, আল্লাহর প্রতি, আখেরাতের প্রতি এবং আখেরাতে যে মহা আযাব ও উৎকৃষ্টতম সওয়াব পাওয়া যাবে, তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। এই বিশ্বাসের ফলে অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহ কেটে যাবে। কেননা, বড় বিষয়ের মহব্বত অন্তর থেকে ক্ষুদ্র বিষয়ের মহব্বতকে অপসারিত করে দেয়। অতএব, যখন দুনিয়ার নিকৃষ্টতা ও আখেরাতের উৎকৃষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে, তখন দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করাকেও খারাপ মনে করবে। কেননা, প্রত্যেক মানুষ যে সামান্য দুনিয়া পায়, তাও মালিন্য ও বিস্বাদমুক্ত থাকে না। সুতরাং আখেরাতে বিশ্বাস থাকলে দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ না করারই কথা। আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন দুনিয়াকে আমাদের দৃষ্টিতে এমন করে দেন, যেমন তাঁর নেক বান্দাদের দৃষ্টিতে করে রেখেছেন।

আশার ক্ষেত্রে মানুষের স্তরভেদ ঃ আশার ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কেউ চিরকাল বেঁচে থাকার আশা করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ

অর্থাৎ, তাদের কেউ এক হাজার বছর বয়স হওয়াকে পছন্দ করে।

কেউ বুড়ো হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চায়। অর্থাৎ, অন্যান্য লোকের যতটুকু বয়স ও জীবন দেখে, ততটুকুরই প্রত্যাশা করে। এরূপ ব্যক্তি দুনিয়াকে অত্যধিক মহব্বত করে। হাদীস শরীফে আছে— বৃদ্ধ ব্যক্তি

দুনিয়ার অন্বেষণে যুবক হয়ে যায়– যদিও বার্ধক্যের কারণে তার হাঁসুলী বাঁকা হয়ে যায়। কিন্তু পরহেযগারদের কথা ভিন্ন। আর তাদের সংখ্যা খুবই কম। কোন কোন ব্যক্তি এক বছর বাঁচতে চায় এবং এর বেশী দিনের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে না। আগামী বছর তাদের অস্তিত্ব থাকবে বলে তারা মনে করে না। তবে গ্রীষ্মকালে শীতের জন্যে এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালের জন্যে উপকরণ যোগাড় করে। সারা বছরের আসবাবপত্র যোগাড় হলে তারা এবাদতে আত্মনিয়োগ করে। কতক লোক শুধু গ্রীষ্ম অথবা শীত মওসুমেই বেঁচে থাকার আশা করে। এ কারণে তারা গ্রীষ্মে শীতের উপকরণ এবং শীতে গ্রীষ্মের উপকরণ সংগ্রহ করে না। কিছু লোকের আশা কেবল একদিন ও একরাত পর্যন্ত সীমিত থাকে। ফলে, তারা সারা দিনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে— আগামীকালের চিন্তা করে না। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ আগামীকালের রূযীর জন্যে যত্নবান হয়ো না। কেননা, তুমি আগামীকালের সময় পেলে, সময় ও রিযিক উভয়টিই পাবে। আর যদি আগামীকাল সময় না পাও, তবে চিন্তা করারও প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ এক মুহূর্তের আশা করে মাত্র। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, হে আবদুল্লাহ, যখন তোমার ভোর হয়, তখন বিকালের চিন্তা করো না। আর যখন বিকাল হয় তখন সকালের চিন্তাকে মনে স্থান দিয়ো না। কেউ কেউ এক মুহূর্ত বেঁচে থাকারও বিশ্বাস রাখে না। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) অদূরে পানি থাকা সত্ত্বেও এস্তেঞ্জার পর মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নিতেন এ আশংকায় যে, যদি পানি পর্যন্ত পৌছার আগেই জীবন শেষ হয়ে যায়। আবার কিছু লোক এমনও রয়েছে মৃত্যু যেন তাদের চোখের সামনেই রয়েছে এবং তাদেরকে গ্রাস করতে চাচ্ছে। এধরনের লোক মৃত্যুর অপেক্ষায়ই থাকে। মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর অবস্থা তা-ই ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি আরয করলেন ঃ আমি পা ফেলার সময় এরূপ ধারণা অবশ্যই রাখি যে, এরপর হয়তো আর দ্বিতীয় পা ফেলতে পারব না। আসওয়াদ হাবশী রাত্রের বেলায় নামায পড়তেন এবং ডানে-বামে তাকাতেন। কেউ তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন ঃ আমি মালাকুল মওতকে দেখি সে কোন্ দিক দিয়ে আমার কাছে আসে। এগুলো হচ্ছে আশার ক্ষেত্রে মানুষের প্রকারভেদ। তাদের প্রত্যেকের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে পৃথক পৃথক মর্যাদা রয়েছে। তবে যার আশা এক মাস, সে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম,

যার আশা এক মাস একদিন। অর্থাৎ, উভয়ের মর্যাদা সমান নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কণা পরিমাণও বে-ইনসাফী করেন না। তিনি বলেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ

অর্থাৎ, যে কণা পরিমাণও সৎ কাজ করবে, সে তা দেখবে।

আশা খাটো হওয়ার প্রভাব আমলের প্রতি অগ্রগামী হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যে দাবী করে যে, তার আশা খাটো, তার দাবীর সত্যতা আমল দ্বারা বুঝা যাবে। যদি সে এমন সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে, যার প্রয়োজন বছরের মধ্যে পড়ে না, তবে বুঝতে হবে তার আশা দীর্ঘ। তাওফীকের আলামত হচ্ছে মৃত্যু চোখের সামনে থাকা, তা থেকে এক মুহূর্তও গাফেল না হওয়া এবং এমনভাবে প্রস্তুত থাকা, যেন এখনি এসে পড়বে। এরপর যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে যায়, তবে আল্লাহর শোকর করবে যে, আল্লাহ তার দ্বারা আনুগত্য করিয়েছেন এবং দিনটি বিফলে যায়নি। এরপর ভোর বেলায় এমনিভাবে প্রস্তুতি নেবে এবং প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তাই করবে। এটা তার জন্যেই সহজ হয়, যে আগামীকালের চিন্তা করে না। এরূপ ব্যক্তি মারা গেলে সৌভাগ্য লাভ করবে এবং জীবিত থাকলে উত্তম প্রস্তুতি ও মোনাজাতের আনন্দে উৎফুল্ল থাকবে।

দ্রুত আমল করা ও বিলম্ব থেকে বেঁচে থাকা ঃ যে ব্যক্তির দু'ভাই বিদেশে অবস্থান করে এবং একজনের আগামীকাল ফিরে আসার ও অপরজনের এক বছর পর ফিরে আসার কথা থাকে, সে সেই ভাইয়ের আগমনেরই প্রস্তুতি নেবে, যে আগামী কাল আসবে। এক বছর পর যে ভাই আসবে, তার জন্যে প্রস্তুতি নেবে না। এ থেকে বুঝা যায়, নিকটতম সময়ে যার অপেক্ষা করা হয়, প্রস্তুতি তার জন্যেই হয়ে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এক বছর পর মৃত্যুর আগমনের অপেক্ষা করে, তার অন্তর সে মেয়াদের সাথেই সংযুক্ত থাকে। সে অন্তর্বর্তী দিনগুলোতে মৃত্যুর প্রতি লক্ষ্য করে না। সে প্রত্যহ সকালে মনে করে এখনও পূর্ণ এক বছর সামনে আছে। সে সেদিনকেই বছরের শুরু মনে করে, যে দিনে সে বিদ্যমান। দিন অতিবাহিত হতে থাকে, কিন্তু এক বছর এক বছরই থেকে যায়– হ্রাস পায় না। এ মনোবৃত্তি তাকে দ্রুত আমল করতে দেয় না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক ব্যক্তিকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বললেন ঃ পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে সুবর্ণ সুযোগ মনে কর—

যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে, সুস্থতাকে রুগ্নাবস্থার পূর্বে, প্রাচুর্যকে দারিদ্রের পূর্বে, অবসর মুহূর্তকে কর্মব্যস্ততার পূর্বে এবং জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ

অর্থাৎ, দু'টি নেয়ামতের ব্যাপারে অনেক মানুষ লোকসানে পতিত— একটি সুস্থতা এবং অপরটি অবসর। অর্থাৎ, মানুষ এ দু'টি নেয়ামতকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে না। কিন্তু যখন এগুলো হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন এর কদর বুঝে। এক হাদীসে আছে— যে ভয় করে, সে রাতের শুরু ভাগেই রওয়ানা হয়ে যায়। আর যে শুরু ভাগে রওয়ানা হয়, সে মনযিলে মকসুদে পৌঁছে যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোনরূপ উদাসীনতা অথবা ভ্রান্তি লক্ষ্য করতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলতেন—

اتتكم الموت راتبة لازمة امابشقاوة وامابسعادة

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে মৃত্যু এসেছে অপরিহার্য হয়ে দুর্ভাগ্য নিয়ে অথবা সৌভাগ্য নিয়ে। কোরআনের আয়াত—

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً -

অর্থাৎ, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন কার আমল সুন্দর, তা দেখার জন্য।

সুদ্দী (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ উদ্দেশ্য এই যে, কে মৃত্যুকে বেশী স্মরণ করে, তার প্রস্তুতি ভালরূপে নেয় এবং তাকে বেশী ভয় করে।

সহীম বলেন ঃ আমি আমের ইবনে আবদুল্লাহর কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি সালাম ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে বললেন ঃ কেন এসেছ বলে ফেল। আমি একজনের অপেক্ষা করছি। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ আপনি কার অপেক্ষায় আছেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, আমি মালাকুল মওতের

অপেক্ষায় আছি। একথা শুনে আমি সেখান থেকে প্রস্থান করলাম এবং তিনি নামাযে আত্মনিয়োগ করলেন।

হযরত দাউদ তাঈ পথ চলছিলেন। এক ব্যক্তি তাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ আমাকে যেতে দাও। আমি আমার প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত সময়কে সুবর্ণ সুযোগ মনে করি। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ সবকিছুতে বিলম্ব করা ভাল— আখেরাতের আমল ছাড়া।

হযরত হাসান (রহঃ) ওয়ায প্রসঙ্গে বলেন ঃ আমল করার জন্যে তাড়াহুড়া কর। কেননা, জীবন কয়েকটি নিঃশ্বাস মাত্র। যদি আটকে যায়, তবে তুমি আল্লাহর নৈকট্য লাভের আমল করতে পারবে না। আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে নিজের চিন্তা করে এবং গোনাহের জন্যে কাঁদে। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ اِنَّمَا نَعُدُّلَهُمْ عَدًّا

অর্থাৎ, আমি তো মানুষের গণনা পূর্ণ করি। অর্থাৎ, শ্বাস-প্রশ্বাসের গণনা করি। গণনা শেষে মানুষের প্রাণ নির্গত হয়।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে কঠোর সাধনায় নিয়োজিত হন। তাঁকে বলা হল ঃ আপনি এত পরিশ্রম করবেন না। নিজের প্রতি নম্রতা করুন। তিনি বললেন ঃ ঘোড়দৌড়ে ঘোড়া যখন দৌড়াতে দৌড়াতে লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি চলে যায়, তখন দৌড়ের যতটুকু ক্ষমতা তার মধ্যে থাকে, সেটুকু নিঃশেষে তখনই ব্যয় করে। আমার মৃত্যুর যে সময় অবশিষ্ট আছে, সেটা এর চেয়েও কম। তিনি অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এমনিভাবে আমল করেছেন। তিনি নিজের স্ত্রীকে বলতেন ঃ বাহন কষে নাও। জান্নাতে অবতরণের কোন কিছু নেই। অর্থাৎ আমলই জান্নাতে অবতরণের বস্তু। অতএব এতে খুব চেষ্টা কর।

মৃত্যু ও সে সময়কার মোস্তাহাব আমল ঃ হযরত লোকমান নিজের পুত্রকে বলেন ঃ বৎস, মৃত্যু কখন আসবে, তা তোমার জানা নেই। সুতরাং অকস্মাৎ মৃত্যু আসার পূর্বে তুমি তার প্রস্তুতি নিয়ে নাও। আশ্চর্যের বিষয়, মানুষ আনন্দ-কোলাহলে মত্ত থাকা অবস্থায় যদি কল্পনা করে যে, এখনি এক সিপাহী এসে লাঠির উপর লাঠি মারতে থাকবে, তবে তার সমস্ত আনন্দ বিস্বাদ হয়ে যাবে। মানুষ জানে, মালাকুল মওত অকস্মাৎ মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণা নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু এতে তার আরাম-আয়েশ এতটুকুও মলিন হয় না। এর কারণ মূর্খতা ও বিভ্রান্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

রূহ কবয করার সময় যে অসহনীয় যন্ত্রণা ও কষ্ট হয়, তার স্বরূপ ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ জানে না। যে ব্যক্তি এই কষ্ট আস্বাদন করে না, সে তা দুই উপায়ে জানতে পারে। এক, অন্যান্য ব্যথা, যা সে ভোগ করেছে, তার সাথে অনুমান করে এবং দুই, অন্যের মৃত্যুকষ্ট স্বচক্ষে দেখে। অনুমান এভাবে হবে যে, মানুষের যে অঙ্গে প্রাণ থাকে না, তাতে ব্যথা অনুভূত হয় না। ব্যথা তখনই হয়, যখন সে অঙ্গে প্রাণ তথা রূহ থাকে। অতএব, যে বস্তু দ্বারা ব্যথা জানা যায়, তা হচ্ছে রূহ। কোন অঙ্গে ক্ষত অথবা জ্বালা হলে তার প্রভাব রূহ পর্যন্ত পৌঁছে এবং যে পরিমাণ প্রভাব পৌঁছে, সে পরিমাণই ব্যথা হয়। ব্যথা যেহেতু মাংস, রক্ত ইত্যাদিতে সরে যায়, তাই রূহ সামান্যই ব্যথা পায়। আর যদি ব্যথা বিশেষভাবে রূহেই হয়, অন্য অঙ্গে না হয়, তবে এ ব্যথা যে একান্তই অসহনীয় হবে, তা বলাই বাহুল্য। মৃত্যু-যন্ত্রণার অর্থ এটাই। এই যন্ত্রণা বিশেষভাবে রূহেই হয়ে থাকে এবং সমস্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ে। দেহে ছড়িয়ে থাকা রূহের কোন অংশই এ ব্যথা থেকে বাদ পড়ে না। উদাহরণতঃ মানুষের গায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে যে ব্যথা অনুভূত হয়, তা শুধু রূহের সে অংশেই থাকে, যা দেহের সেই অংশে বিদ্যমান। কিন্তু কোন অঙ্গ আগুনে পুড়ে গেলে তার জ্বালা সমগ্র দেহে অনুভূত হয়। কেননা, আগুনের সকল অংশ দেহের সমগ্র অংশে অনুপ্রবেশ করে। কোন অংশ আগুন থেকে বাদ থাকে না। ফলে, রূহেরও কোন অংশ ব্যথা থেকে বাদ পড়ে না। মৃত্যু কষ্টও আগুনের জ্বালার অনুরূপ। রূহকে প্রতিটি শিরা-উপশিরা থেকে টেনে টেনে বের করা হয়। একারণেই বলা হয়, মৃত্যু তরবারির আঘাত, করাত দিয়ে চিরা এবং কাঁচি দিয়ে কাটার তুলনায় অধিকতর কষ্টকর। তবে তরবারির আঘাতে মানুষ চিৎকার করে; কিন্তু মৃত্যু-যন্ত্রণায় চিৎকার করে না। এর কারণ মৃত্যু-যন্ত্রণা মানুষের অন্তর, জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গের শক্তি নিস্তেজ করে দেয়। ফলে, সমস্ত অঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে এবং চিৎকারের ক্ষমতা থাকে না। তরবারির আঘাতে এমন হয় না।

মৃত্যু-যন্ত্রণায় মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গ ক্রমান্বয়ে মরতে থাকে। প্রথমে পদ যুগল শীতল হয়, এরপর গোছা, এরপর উরু, এরপর মৃত্যু কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এসময় তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং অনুতাপ-অনুশোচনা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কণ্ঠে দম আটকে যাওয়ার শব্দ না হওয়া পর্যন্ত বান্দার তওবা কবুল হয়। কোরআনের আয়াত—

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ -

অর্থাৎ, তাদের জন্যে তওবা নেই, যারা গোনাহ করতে থাকে, অবশেষে যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন বলে আমি এখন তওবা করলাম। হযরত মুজাহিদ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন— উদ্দেশ্য সে সময়, যখন মালাকুল মওত ও ফেরেশতাগণ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। মোটকথা, অন্তিম মুহূর্তে মৃত্যুর তিক্ততা ও কঠোরতা বর্ণনাযোগ্য নয়। একারণেই রসূলে করীম (সাঃ) দোয়া করেছেন—

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ -

অর্থাৎ, এলাহী, মোহাম্মদের উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ করুন।

মানুষ এবিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে না। কারণ, তারা এ কষ্ট অনুমানই করতে পারে না। পয়গম্বর ও ওলীগণ খোদায়ী নূরের সাহায্যে এটা অনুমান করতে পারেন। তাই তাঁরা মৃত্যুর পূর্বে খুব ভয় পান। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ হে হাওয়ারীগণ! আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া কর, যাতে তিনি আমার উপর মৃত্যুর কঠোরতা সহজ করে দেন। কারণ, আমার মধ্যে মৃত্যুর ভয় এত বেশী যে, মরার আগেই মরে যাওয়ার দশা। বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের কিছু লোক এক কবরস্তানের কাছ দিয়ে গমন করছিল। তারা পরস্পরে বলল ঃ এস দোয়া করি, যাতে এক ব্যক্তি কবর থেকে বের হয়। আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। অতঃপর সকলেই দোয়া করলে এক কবর থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে এল। তার দুচোখের মাঝখানে সেজদার চিহ্ন ছিল। সে বলল ঃ লোক সকল, আমার কাছে তোমাদের কি প্রয়োজন? পঞ্চাশ বছর হয় আমি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত এর তিক্ততা মুখ থেকে দূর হয়নি।

হযরত হাসান বর্ণনা করেন— রসূলে করীম (সাঃ) মৃত্যুর ব্যথা ও গলায় আটকে যাওয়ার কথা বর্ণনা করে বলেছেন— এর কষ্ট তরবারির তিনশ' আঘাতের সমান।

হযরত আলী (রাঃ) মানুষকে যুদ্ধে যেতে উৎসাহিত করে বলতেন, যদি তোমরা যুদ্ধে নিহত না হও, তবু মরবে। সেই সত্তার কসম, যাঁর কবযায়

আমার প্রাণ, হাজার তরবারির আঘাত আমার কাছে শয্যায় মৃত্যুবরণ করার তুলনায় সহজ।

শাদ্দাদ ইবনে আওস বলেন ঃ ঈমানদারের কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে কোন ভয় মৃত্যুর চেয়ে বেশী নেই। মৃত্যু যন্ত্রণা করাত দিয়ে চিরা, কাঁচি দিয়ে কাটা এবং পাতিলে সিদ্ধ হওয়ার তুলনায় বেশী। যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে কোন মৃত জীবিত হয়ে দুনিয়াবাসীকে মৃত্যুর কষ্ট শুনিয়ে দেয়, তবে তারা নিজের জীবন দ্বারা কোন উপকার গ্রহণ করবে না এবং নিদ্রায়ও সুখ পাবে না।

জনৈক বুযুর্গ প্রায়ই রোগীদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, মৃত্যু তোমার কাছে কেমন? যখন তিনি নিজে মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হলেন, তখন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ মৃত্যু আপনার কাছে কেমন মনে হয়? তিনি বললেন ঃ মনে হয় যেন আকাশ এসে পৃথিবীর সাথে মিশে গেছে, আর আমার আত্মা সূঁচের ছিদ্র পথে বের হয়ে আসছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

موت الفجاة راحة للمؤمن واسف على الفاجر -

অর্থাৎ, আকস্মিক মৃত্যু মুমিনের জন্যে সুখ এবং পাপাচারির জন্যে পরিতাপ।

বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন ওফাত পেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ হে আমার খলীল, তুমি মৃত্যুকে কেমন পেয়েছ? তিনি বললেন ঃ যেমন উত্তপ্ত শিক ভিজা তুলার মধ্যে রেখে টেনে নেয়া হয়। আল্লাহ বললেন ঃ আমি তোমার উপর মৃত্যুকে সহজ করেছি।

সহীহ রেওয়ায়েতে আছে— ওফাতের সময় রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে একটি পেয়ালায় পানি রাখা হয়েছিল। তিনি সে পানিতে হাত ভিজিয়ে ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে বুলাতেন এবং বলতেন—

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَىَّ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

অর্থাৎ, ইলাহী, আমার উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ কর।

হযরত ফাতেমা বলতেন, আব্বাজান, আপনার কি কষ্ট! তিনি জওয়াবে বলতেন ঃ আজকের পর তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট নেই।

হযরত ওমর (রাঃ) কা'বে আহবার (রাঃ)-কে বললেন ঃ মৃত্যুর কিছু

অবস্থা বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ মৃত্যু এমন, যেমন কোন কাঁটাদার শাখা কোন মানুষের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয় এবং প্রত্যেকটি কাঁটা তার সমস্ত শিরা-উপশিরায় বিদ্ধ হয়ে যায়। এরপর কোন সবল ও সুঠাম ব্যক্তি শাখাটি ধরে সজোরে টান দেয়। ফলে যা আসে, তা আসে এবং যা থাকে, তা থেকে যায়।

মৃত্যুর এ কঠোরতা আল্লাহ তা'আলার ওলী ও দোস্তগণের প্রতি। আমরা তো গোনাহে নিমজ্জিত। আমাদের কি অবস্থা হবে? মৃত্যু-যন্ত্রণা ছাড়া আমাদের উপর আরও বিপদ আপতিত হবে। মালাকুল মওতের চেহারা দেখা একটি বড় বিপদ। মালাকুল মওত যে চেহারা নিয়ে গোনাহগারদের রূহ কবয করে, তা সর্বাধিক শক্তিশালী ব্যক্তিরও দেখার সাধ্য নেই। হযরত ইবরাহীম (আঃ) একবার মালাকুল মওতকে বললেন ঃ যদি সম্ভব হয় তুমি আমাকে সে আকৃতি দেখাও, যা ধারণ করে তুমি গোনাহগারের রূহ কবয কর। মালাকুল মওত আরয করল ঃ আমি দেখাতে পারি; কিন্তু আপনি সহ্য করতে পারবেন না। তিনি বললেন ঃ কেন সহ্য করতে পারব না? মালাকুল মওত বলল ঃ মুখ ফেরান। তিনি মুখ ফিরিয়ে পুনরায় তার দিকে তাকাতেই দেখলেন, একজন কৃষ্ণকায়, কেশ খাড়া দুর্গন্ধযুক্ত কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি তার সামনে দাঁড়ানো। তার মুখ ও নাকের ছিদ্র দিয়ে অগ্নিশিখা ও ধোঁয়া বের হচ্ছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। এরপর যখন জ্ঞান ফিরল, তখন মালাকুল মওত পূর্বের আকৃতিতে বিরাজমান ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ যদি গোনাহগার ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তোমার চেহারা দেখা ছাড়া অন্য কোন কষ্ট না হয়, তবে এটাই তার কষ্টের জন্যে যথেষ্ট।

আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দা মালাকুল মওতকে অত্যন্ত সুশ্রী ও সুগঠিত দেখতে পায়। হযরত ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর একটি বিশেষ এবাদত কক্ষ ছিল। তিনি বাইরে যাওয়ার সময় সেটি বন্ধ করে যেতেন। একদিন ফিরে এসে কক্ষের ভেতরে এক ব্যক্তিকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাকে আমার কক্ষে কে দাখিল করল? লোকটি বলল ঃ কক্ষের মালিক। তিনি বললেন ঃ কক্ষ তো আমার। সে বলল ঃ আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, যিনি আপনার ও আমার চেয়ে বেশী মালিক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোন ফেরেশতা? সে আরয করল, আমি মালাকুল মওত। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ তুমি যে আকৃতি ধারণ করে মুমিনের রূহ কবয কর, তা আমাকে দেখাতে পার কি? সে আরয করল ঃ হাঁ, একটু মুখ